রঙমহল

(নাচ-গান-রঙ-তামাসার, [illegible])

"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ

ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে-প্রণীত

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা.

১৩৩৮

এক টাকা

গ্রন্থকার

The Amrita Bazar Patrika

CALCUTTA, APRIL 5, 1931.

BOOKS & REVIEWS

"Meghnath"—A five Act drama by Natyakar Gosta Behari Dey, Published by the Eastern Law House, 15, College Square, Calcutta. 162 Pages price Re. 1.

We are glad to note that "Meghnath" which kept audience spell-bound at the Monomohon Theatre has appeared in print. The author has, through the pages of this drama, depicted the days of old when the Bengalees were not as emaciated as they are at present but could face the dacoits and check their inroads. "Meghnath" the hero is a true representation of such a Bengalee. Born in a low family, a dacoit by profession and illiterate, he dedicated his life for the protection of the women and the oppressed. The drama is an opportune publication as it deals with social and religious topic of the present day.

বিজ্ঞপ্তি

ইহা একখানি নূতন ঢঙের নবন্যাস। নিপুণ চিত্রকরের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত চিত্র দর্শনে রসিক পাঠকপাঠিকা রসের মধুরিমায় নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। প্রহসনের ভঙ্গিতে উড়ের ঝগড়া, কাবুলির লড়াই প্রভৃতি প্রীতিপদ ঘটনার সন্নিবেশে রুচিপ্রিয় করিতে ত্রুটি করি নাই। এ ধরণের নবন্যাস সাহিত্য জগতে এই নূতন ও প্রথম। এ নব রঙমহলে সাহিত্যমোদী মাত্রই নব নব আনন্দের উপভোগ্য পাইবেন।

আর এক কথা, আমার কনিষ্ঠ মাতুল ডাক্তার ভবানী চরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত রুচি মধুর গানগুলি সন্নিবেশিত করিয়া এই নবন্যাসখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটি করি নাই। একারণ ইহাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

অবশেষে নিবেদন, এই নবন্যাসখানি সাধারণে আদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
মহাষ্টমী
১৩৩৮।

গ্রন্থকার

ডাক্তার ভবানীচরণ শাস্ত্রী

রঙমহল

জল উঁচু,—জল উঁচু!
জল নীচু,—জল নীচু!

প্রথম উল্লাস

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফটিক চাঁদের বৈঠকখানায় ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বলিতেছে। মটুকচাঁদ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল,—তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—

"তাইত, পাঁচটা বেজে গেল, তবু কারও দেখা নেই। সাতকোড়েই বা গেল কোথা? সমস্ত দিন বাজার করা গেল, মাথাটাও ভারী ধরেছে, কিছুই ভাল লাগছে না, আর কাঁহাতক্ হাঁ ক'রে একলাটি বসে থাকি।"

মটুকচাঁদ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—

"ওরে রামধন! ও রামধন!"

গালাগালির ভয়ে ভৃত্য রামধন বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে মটুকের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

মটুক জিজ্ঞাসিল,—

"হ্যাঁরে রামধন! বাবু কোথায়?"

রাম। এজ্ঞে বাড়ীর ভেতর।

মটুক। হ্যাঁরে রামধন, নিরামিষ ব'সে থাক্‌বো?

রাম। এজ্ঞে বসুন্‌ এস্‌চি।

রামধন প্রস্থান করিল। কিছু পরে মদের বোতল, সোডার বোতল ও গেলাস লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল।

মটুক। বাহ্‌বা রামধন! বেঁচে থাক বাবা! যেখানে নেই রামধন, সেইখানেই চন্‌ চন্‌, কিছু চাট্‌ টাট্‌ নেই বাবা?

রামধন মনে মনে বলিল,—

"কুঁজো জ্বালিয়ে মারে।"

খানকতক সুপারি দিয়া প্রস্থান করিল।

মটুকচাঁদ দুই গ্লাস উপরি উপরি টানিয়া মনের উল্লাসে বলিতে লাগিল,—

"হুঁ! মটুকচাঁদ;—অ মটুকচাঁদ! তুমি কে? তুমি কে জান না? সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার মাসী? তুমি যে ফটিকচাঁদের মোসাহেব! পৃথিবী শুদ্ধু লোক জানে, আর তুমি জান না, এও কি একটা কথা? হায়! হায়! হায়! এ দুঃখু রাখ্‌বার্‌ যায়গা কোথায়? খোঁড়া ভূতো, কানা সাতকোড়ে, আর দেবা,—একে কটা, তাতে গুণ্ডা, তাতে আবার চুয়াড়ে, মোসাহেবীর ধারও ধারে না। ওরা ত ৩ নম্বর, মোসাহেবী

কোত্তে কি জানে? মোসাহেবীর "মো"ও জানে না! মটুকচাঁদ! তুমি মোসাহেব ব'লে মোসাহেব! ১ নম্বর মোসাহেব! বলি, তোমার নামটি কেমন, নামের বাহার কত! ফটিকচাঁদ তার পরেই মটুকচাঁদ! (ঘাড় দোলাইয়া) ফটিকচাঁদ-মটুকচাঁদ, ফটিক-চাঁদ-মটুকচাঁদ, ফটিকচাঁদ-মটুকচাঁদ; চাঁদের ছড়াছড়ি, বাহার হ'বে না কেন? একি ভূতো, সাতকোড়ে, না গুণ্ডা দেবা, নামেও যেমন কাজেও তেমন! মোসাহেবী খাতায় খালি নামই লিখিয়েছে! কাজে কি, তা মা গঙ্গাই জানে। আহা! ফটিক বাবু তোমায় ভালবাসে কত, তা তুমি কি জান্‌বে? তুমি বাবুর ডান হাত। বাবুর মন যোগাতে,—জল-উঁচু,—জল-উঁচু; জল-নীচু,—জল-নীচু ক'র্‌তে, হাই তুল্লে তুড়ি দিতে যেমন পার, এমন আর কে পারে? তাই বলি মটুকচাঁদ তুমি কে? (বুক ঠুকিয়া) তুমি ফটিক বাবুর ১ নম্বর মোসাহেব! তোমার নাগাল পায় কে? তোমার কদর কত? তুমি না হ'লে বাবুর এক দণ্ডও চলে না! বাবুর সখের বাজার,—হাট বাজার, যা কিছু সবই তোমার হাতে! হাঃ! হাঃ! হাঃ! কি মজা! কি মজা! এক পয়সার ধন আট পয়সা! এমন সুখ আর কোথায় পাবে? হাঃ! হাঃ! হাঃ! মটুক! বাবু তোমার বেঁচে থাক্! বাবু ত ফটিক বাবু! আর বাবু কোন্ শালা! সাত চড়ে একটা পয়সা বেরোয় না, সে আবার বাবু? বাবু ত ফটিক বাবু, আর সব বাবিয়া! ধনে, মানে, কুলে, শীলে যা'তে দেখুন কা'তেও কমতি

নয়! এক মেটে বুরুজের নবাব যা বাবুগিরি ক'রে গেছে! আর তোমার ফটিক বাবু যা বাবুগিরি ক'র্‌চে! তোমার বাবুর মত এমন উঁচু নজর কি আর কা'রও হবে? বাবু তোমার ক্ষণজন্মা পুরুষ, বৃষলগ্নে জন্ম, তা না হ'লে এমন উঁচু নজর হবে কেন? বাবু তোমার সকল গুণের আধার, ছোট কথায় কান দেন না! অনেক শালা-শালী তোমার পেছনে বড্ড লেগেছে! তা লাগুক্, কুঁজোর বুদ্ধির ভেতর ঢুকতে ওদের বাবার বাবা তার বাবাও পার্‌বে না! বাবু তোমার মুঠোর ভেতর! ঐ কে আস্‌চে না? ভাল নেশা হ'ল না, এইবার ভর্‌পুর্ আর এক ডোজ্ টেনে নি! দেবা এসে প'ড়্‌লে আর হ'বে না।"

এই বলিয়া মটুকচাঁদ যেমন আর এক ডোজ্ টানিতে যাইবে; এমন সময়ে ফটিকচাঁদের পরামাণিক গৃহে প্রবেশ করিল। পরামাণিককে সম্মুখে দেখিয়াই মটুক বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল,—

"ওরে বেটা পরামাণিক আগে আমায় কামিয়ে দে।"

পরামাণিক মুখভঙ্গি করিয়া বলিল,—

"এজ্ঞে মশাই, আপনার কাছেই ত এসেছি!"

মটুক রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—

"দেখ্ শালা নাপ্‌তে! মুখ সাম্‌লে কথা কোস্! আমি কে জানিস্? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো!"

পরামাণিক রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—

"তোমার মতন ঢের্ ঢের্ মোসাহেব দেখেছি, জুতো ছিঁড়্‌লে

সেলাইয়ের পয়সা জোটে না, তার আবার নবাবি! মুরোদ কত তা জানা আছে।"

যে সময়ে উহাদিগের ঐরূপ বাক্ বিতণ্ডা চলিতেছিল। সেই সময়ে ফটিক বাবু, সাতকড়ি, ভূতনাথ ও দেবেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গোলমাল শুনিয়া ফটিকচাঁদ বলিলেন,—

"এত গোল কিসের?"

পরামাণিক। দেখুন দেখি বাবু মশাই, আমার কন্যাদায় উপস্থিত, আপনার নিকট কিছু যাচঞে ক'র্‌তে এসেছি, মটুকবাবু বলেন্ কি না,—"ওরে বেটা পরামাণিক, আগে আমায় কামিয়ে দে।" আবার বলেন্ কি না,—"জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো!"

ফটিকের বড় রাগ হইল, রাগে রাগে বলিলেন,—

"ছিঃ! ছিঃ! যার্ তার্ সঙ্গে ঝগড়া করা স্বভাবটা তোর কিছুতেই গেল না! ফের্ যদি এ রকম বেয়াদবি শুনি, তা'হোলে আমি তোকে চাবুকে লাল ক'রে দোবো।"

মটুকের মুখে আর কথা নাই, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ফটিকচাঁদ মটুককে শাসাইয়া পরামাণিককে বলিলেন,—

"আজ থাক্, কাল সকালে এস।"

পরামাণিক চলিয়া গেল।

ফটিকচাঁদ আমোদ বড় ভালবাসেন। মটুককে মাথা হেঁট করিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সাতকড়ি, ভূতনাথ ও দেবেনের ভাল লাগিল না।

সাতকড়ি ও ভূতনাথ মটুকের পৃষ্ঠে ঘন ঘন চপেটাঘাত করিতে লাগিল, আর সেই অবসরে দেবেন মটুকের নাকে নস্য প্রদান করিল।

মটুক। হ্যাচো!—হ্যাচো!—হ্যাচো! ওবে শালা দেবা,—হ্যাচো! গেলুম্ রে—হ্যাচো! মলুম্ রে—হ্যাচো! ওঃ হো,—হ্যাচো! নেশা কাটিয়ে দিলে শালা!—হ্যাচো! ওয়াক্!—ওয়াক্!—ওয়াক্!

হাঁচির ধূম দেখিয়া ফটিকচাঁদ হাসিয়া আকুল। পরে যখন হাসির চোটে মটুক বমি করিতে উদ্যত হইল, তখন ফটিকের টনক নড়িল বলিলেন,—"ওই বমি ক'র্‌লে!—ওই বমি ক'র্‌লে! ওকে শীগ্‌গির নিয়ে যাও!"

মটুকের তখনও ভরপূর নেশা হয় নাই, বলিল,—

"আমি এখান থেকে নড়ছিনে বাবা! ভরপুর নেশা না হোলে আমি যাচ্ছিনে বাবা! ওয়াক্!—ওয়াক্!—ওয়াক্!"

ফটিকচাঁদ মটুকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"ভূতো? ওটাকে এক ডোজ্ দে, ঠাণ্ডা হোক্।" বলিয়া বসিয়া গেলেন। মোসাহেবেরাও মদের বোতল লইয়া বসিল। মটুককে আর পায় কে? সকলের হাত হইতে মদের গেলাস কাড়িয়া লইয়া উপর্যুপরি দুই চারি ডোজ্ টানিল। তাহাতেও আশা মিটিল না, শেষে ফটিকের গেলাসে হাত বাড়াইল।

দেবা, মটুকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"দূর্ শালা, এক ছটাক মদ টেনে মাতাল হ'য়ে পড়ে, আবার।" বলিয়া গেলাস কাড়িয়া লইল।

মটুক। দেখ্ দেবা! তুই ব'লেই রক্ষে পেলি, তা না হ'লে এই বোতলে তোর মাথা ফাটাতুম্।

দেবেন কিছু বলিল না, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল। ফটিকচাঁদেরও স্ফূর্ত্তি চাগিয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন,—

"দেবা একটা গান গা।"

দেবেন গান ধরিল,—

> ধর ধৈর্য্য ধর।
> ও ভূধর বালা, আজ মালা ধর;—
> কি জন্যে হয় রাগে কম্পিত ওষ্ঠাধর॥
> দয়া কর দয়াকর, আমায় ক্ষমা কর,
> সূক্ষ্ম বিচার কর, দাসের বাক্য ধর,
> যে দিকে বারি বর্ষে সেইদিক ছত্র ধর॥
> তুমি যে প্রতিজ্ঞা ধর, জানেন্ সূর্য্য শশধর,
> সে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখ্‌বেন্ গঙ্গাধর,
> চাতকেরে কর্‌বেন দয়া সেই জলধর॥

ফটিকচাঁদের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সাতকড়ি ও ভূতনাথের স্ফূর্ত্তি চাগিয়া গেল। উহারা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য গানের সঙ্গে নাচ জুড়িয়া দিল।

মটুক। যেমন শালা কানা, তেমনি শালা খোঁড়া; নাচ নয় যেন উচ্চিংড়ে লাফাচ্চে! দেখ্ শালারা দেখ্—নাচ্ দেখ্?

মটুকের নাচ আরম্ভ হইল।

সাতকড়ি। নাচ্চে,—যেন কোলা বেঙ্ লাফাচ্চে!

নাচিতে নাচিতে, পা টলিয়া মটুকের গড়াগড়ির বাহার খুলিল।

ভূতনাথ। বাহবা কি বাহবা!

সাতকড়ি। কুঁজো গড়ালো—গড়ালো

ফটিক। মোটকো ওঠ্ তোরই জিৎ!

এমন সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল,—

"আজ্ঞে সব প্রস্তুত।"

ফটিক। রাত হোয়েছে চল হে চল।

যাইবার সময়ে দেবেন হাঁক দিয়া বলিল,—

"ওরে রামধন, ঘর পরিষ্কার কোরে দিয়ে যা।"

ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া রামধন মনের আনন্দে বলিতে লাগিল,—

"কি সৌভাগ্যি! কেউ নেই,—বাহবা কি বাহবা!—কি মজা! কি মজা! সাৎশো রগড়! পাথরে পাঁচ্ কিল! খোরায় লাথি! কুঁজো, কানা, খোঁড়া, চুয়াড়ের জ্বালায় কি কিছু মজা কর্‌বার যো আছে? যখন্ তখন্ একটা না একটা মুরোদ খাড়া হ'য়ে থাকেই থাকে! হয় মদ খাচ্চে! না হয় ঝগ্‌ড়া ক'চ্ছে! না হয় ভাদ্র মাসের সাঁড়া-সাঁড়ী বান ডাকার মত নাক

ডাকাচ্চে ! নাক ডাকার বেশী ধূম ঐ চুয়াড়ের ! যেমন দেখ্‌তে চুয়াড়ে ! কথাও চুয়াড়ে ! ঘুমও চুয়াড়ে ! সে দিন খাবার কিন্‌তে চুরি ধরা প'ড়েছেল, যে রকম ক'রে উঠেছেল, একেবারে আঁত্‌কে উঠেছিলুম্‌ ! পেটের ভাত চাল হোয়ে গেছ্‌ল ! তা করুক্‌, লোকটা এদিকে ভাল। আর সাতকড়ি ভূতনাথ ওরা কোন কথায় নাই, ও দুজনে খুবই ভাল। কুঁজো শালা, ওটাকে দেখ্‌লে সর্ব্বাঙ্গি জ্বলে যায় ! যখন চিৎ হ'য়ে হাত পা বেঁকিয়ে শুয়ে থাকে, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটা কোলা বেঙ্‌ প'ড়ে আছে। ওটাকে দেখ্‌লে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। এত লোক মর্‌চে, কুঁজোটার মরণ নেই ! কুঁজোটা যদি গলায় কাঁটা লেগে মরে যায় তা'হোলে বেশ হয় ! মাচের কাঁটায় মর্‌বে না ; শালা ভূষুণ্ডি ঠিক্‌ বেঁচে উঠ্‌বে ! খাসির হাড় গলায় বিঁধে যায়, তবে যদি মরে ! হা আমার অদেষ্ট ! তা কি হবে ! বাজার কোত্তে এতটা পয়সা পায়, সব লোপাট। আমায় কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয় না। তা হোক্‌, আমার নাম রামধন, যেৎ থেকে হোক্‌, দু পয়সা ক'রে ন'বই ন'ব,—আমি কুঁজোর ধার ধারি না। মনে করি ব'লে দোবো। তা বাবু কি আমার কথা বিশ্বেস্‌ ক'র্‌বেন ? লাভের মধ্যে আমার চাক্‌রিটি যাবে। চাক্‌রি ব'লে চাক্‌রি, এমন সোনার চাক্‌রি গেলে আর হ'বে না। তা যা হোক্‌, দুঃখু ক'র্‌লে আর কি হবে,—একদিন না একদিন সময় ফির্‌বেই ফির্‌বে ! বাবুর খেয়ে আস্‌তে নটার বেশী বৈ কম হ'বে না। বিশেষ আজ

চার মূর্ত্তিমান ব্যোমই হাজির আছে। আর কি রক্ষে আছে, দেরী ত হবেই। তবে এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? অনেক দিনের আশাটা মিটিয়ে নি। কোল্‌কেয় ভর্‌পুর তামাক রোয়েছে, মিঠে মিঠে গন্ধ ছাড়্‌ছে! চার টাকা সেরের তামাক, বাবার জন্মেও কখন খাইনি, একবার আলবোলায় টেনে নি। (তামাকু সেবন) খাসা তামাক। প্রাণ তর্‌ হ'য়ে গেল। দেখি দেখি বোতলে কিছু আছে কি না? কি মজা! কি মজা! আজ অনেকটা আছে। একটু খাই।"

রামধন মদ্যপান করিল, তারপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বাবুর স্বর অনুকরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—

"অ ভাগা—অ ভোলা।"

ফটিকবাবু ডাকিতেছেন মনে করিয়া ভাগা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল। বাবুর আসনে রামধনকে বসিতে দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইল। আনন্দে আনন্দে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—

"হো ভলা ভাই,—হো ভলা ভাই, ঝট করি এঠিকি আস।"

রামধন। গাঁড়িপ শাঁলা চুপ্‌,—চেঁচাবি ত টিকি কেটে দোবো,—চুপ্‌!

ভাগার চীৎকারে ভোলা আসিয়া উপস্থিত হইল, রামধনকে বাবুর বিছানায় দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—

"রামধন বাবু হইচি, বাবুর বিছানায় বসিছি, দেখি বাকু বড় ভাল হইচি! রামধন বেশ ভাই বেশ, বেশ মজাটা করচি!"

লাল জল রামধনের পেটে গিয়া স্ফূর্ত্তির উপর স্ফূর্ত্তি চাগিয়া গিয়াছিল। সে গেলাসে মদ ঢালিয়া ভাগার মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল,—

"খেয়ে নে বেটা খেয়ে নে। বাপের জন্মে কখন পাবিনি, বেটা খেয়ে নে।"

ভাগা। মোর জাতি যিব, মোর জাতি যিব।

রামধন। বেটা খা ব'ল্‌চি। তুই আগে খা, তারপর ভোলা খাবে, খায় না খায় পরে বোঝা যাবে।

ভোলা। মু খাইলে মোর জাতি যিব, মতে ঘরু বাহার করি দেবে।

রামধন। গাঁড়িপ শুঁড়া, তোদের জাত কি আর আছে? খাবি কি না বল্‌, না খেলে এখনই গায়ে মদ ঢেলে দোবো। খা, কাকেও বাল্‌বো না খা, বাবু এখনই এসে পোড়বে।

ভাগা ও ভোলা অনেক দিন কলিকাতায় থাকিয়া বিশেষ ফটিক বাবুর ন্যায় মাতাল মনিবের ফারফরমায়েস খাটিয়া এক রকম পাকা হইয়াছিল, মদের উপর তাহাদের লোভ জন্মিয়াছিল, কিন্তু মদের স্বাদ জানিবার সুবিধা পায় নাই, আজ রামধনের অভ্যার্থনায় তাহাদের বহুকালের আশা মিটিবার সুবিধা হইল, উভয়েই মদ্য পান করিল।

রামধন হাসিয়া বলিল,—

"কেমন দেখ্‌ দেখি, ভাল মানুষটির মতন খেলি, কোন গোল

হ'ল না। নে,—বাবুর যেমন হাত পা টিপিস্, তেমনি ক'রে আমার হাত পা টিপে দে।"

ভাগা ও ভোলা হস্ত পদ মর্দ্দনে সিদ্ধ হস্ত ছিল, তাই ফটিকচাঁদ সময়ে সময়ে তাহাদের দ্বারা হাত পা টিপাইয়া লইতেন। আজ তাহাদের হস্তপদ মর্দ্দনে রামধনের বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল, আহ্লাদে দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল,—

"তোরা গান টান জানিস্ ?"

ভোলা। ভাগা জানে।

রামধন। বটে! ভাগা একটা গান গা।

ভাগা বোতলের প্রতি আঙ্গুল বাড়াইয়া রামধনের পা দুখানি মাথায় ধারণ করিল, দুই চারি ফোঁটা চোখের জলও গড়াইল। রামধনের দয়া হইল, বলিল,—

"গান গাস্ ত মদ্ দোবো। পা ছাড়্ দিচ্চি।"

ভাগাকে ভরপূর এক গ্লাস মদ দিল। ভাগা মদ্যপান করিয়া গান ধরিল,—

কাঁহি কিরে জীবধন মোঠারে করিছ মান।
তোঁহ পাই রখিয়াছি আতর চুয়া চন্দন॥
কর্প্পূর বিড়িয়া পান, বালসরি কলিচুণ,
কলকতা ডাল চিনি, কটক মসলা মান॥
সুরতি রসরে রস, আসিন পলঙ্কে বস,
হঁসি মুখে কহ কথা মনরু যাউরে মান॥

রামধন। চুপ্! বাবুদের খাওয়া হ'য়েচে, চুপ্! ঐ কুঁজো চেঁচাচ্চে, যা তোরা সরে থাক্‌গে যা। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে নো'ব।

ভাগা ও ভোলা ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল। রামধন ঘর পরিষ্কার করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। ফটিকচাঁদ মোসাহেবগণে বেষ্টিত হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। রামধন তামাক দিবার অছিলায় প্রস্থান করিল।

মোসাহেবগণ ও ফটিকচাঁদ আসন গ্রহণ করিলেন।

দুই একটী অন্য কথার পর, ফটিক বাবু বলিলেন,—

"ঠাকুর আজ আমড়ার চাট্‌নিটা বড় মুখগ্রীয় করেচে।"

বাবুর কথা শেষ হইবা মাত্র সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মধু!—মধু!—মধু!"

ফটিক। কচি আমড়ার চাট্‌নি মুখপ্রিয় বটে, কিন্তু পাকা আমড়া রোগের জড়। সাক্ষাৎ যম রাজার ভাইরা ভাই।

মটুক। তা আর বল্‌তে, হাড় থেকে টেনে রোগ বার করে!

সাতকড়ি। পাকা আমড়া আবার মানুষে থায়?

মটুক। আমি এত বড় হয়েচি, খাওয়া চুলোয় যাক্, কস্মিন্ কালেও পাকা আমড়ার ত্রিসীমায় যাই নি।

ফটিক। তপসে মাছের কাটলেটটা বামুন ভাল যুৎ কোত্তে পারেনি।

ভূতনাথ। রাম!—রাম!—রাম! মুখে দেওয়া যায় না!

মটুক। মুখে দিলে আপনা হতেই বেরিয়ে আসে। তেল চিটে গন্ধ, থু!—থু!—থু!

সাতকড়ি। ঠাকুরটির কেবল মুখ সর্ব্বস্ব। আমার বামুন হ'লে ঝাঁটা মারতে মারতে বিদেয় করতুম্।

ফটিক বাবু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—

"বামুনের দোষ নাই, পেট ভরলে সন্দেশও তেত লাগে।"

মটুক বলিল,—

"তা বই কি! তা বই কি! রান্না বড় চমৎকার হোয়েচে! উইলসন্ হোটেলকে ঝক্ মেরেচে।"

দেবেন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, কোন কথা কয় নাই, এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল,—

"আমি এত কাল মোসাহেবী করলুম, তোদের মতন ঠাট্ ঠমক্ এখনও শিখলেম্ না; পায়ে পড়ি তোরা একটু থাম্!"

দেবেনের কথায় মটুকের অত্যন্ত রাগ হইল; অঙ্গুলি ঘূরাইয়া বলিল,—

"দেখ্ দেবা, মুখ সামলে কথা কোস্, তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! তুই ব'লে রক্ষে পেলি, আর কেউ হ'লে ঘুসিয়ে ঘুঁসিয়ে মাথা ভেঙ্গে দিতুম্।"

মটুকের কথায় দেবেন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, আর কোন কথা বলিল না।

রাত্রি তুই প্রহর অতীত। মোসাহেবদিগকে শয়ন করিতে বলিয়া, ফটিক বাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় উল্লাস

"যেমন গুরু তেমনি চেলা।
টক্ ঘোল তার ছেঁদা মালা॥"

কলুটোলায় গোবিন্দ বারিক নামে এক কলু বাস করিত। তাহার এক স্ত্রী ও এক মাত্র পুত্র, তদ্ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। পুত্রের নাম হরিদাস। গোবিন্দ পাড়ায় পাড়ায় তেল বেচিয়া বেড়াইত, পাড়ার সকলে তাহাকে গবিন্ কলু বলিয়া ডাকিত। গোবিন্দের একখানি ঘানী ছিল, সেই ঘানীতে যে তৈল উৎপন্ন হইত, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া গোবিন্দ এক প্রকার কষ্টে-স্বষ্টে সংসার চালাইত।

হরিদাস গোবিন্দের বুড়া বয়সের ছেলে, এ কারণ হরিদাস বাপ মায়ের বড় আদরের। অধিক আদরে হরিদাসের কিছু লেখা পড়া হইল না। হরিদাসের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন গোবিন্দ তাহাকে পাঠশালায় দিল। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নাম বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী। ভর্ত্তির সময়ে পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেরা হরিদাসের লম্বা লম্বা হাত, লম্বা লম্বা পা, লম্বা লম্বা কান, লম্বা লম্বা চুল, আর আলকাতরার মত কাল রং দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল।

পাঠশালায় যত ছেলে পড়িত, হরিদাস তাহাদের সকলের অপেক্ষা বয়সে না হউক, আকারে দীর্ঘে-প্রস্থে বড়। হরিদাস বড় দুরন্ত বালক, সকলের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করিত;—কাহাকেও চিম্‌টি কাটিয়া, কাহাকেও কিল মারিয়া কাহারও বা কান কামড়াইয়া, পাঠশালার মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধাইত। বালকদিগের নালিশ শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাস গুরুমহাশয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত। গুরু-মহাশয় বেত মারিয়াছেন, কি না মারিয়াছেন, হরিদাস এমন বিকট চীৎকার করিত যে, গুরুমহাশয়ের হাতের বেত হাতেই থাকিত, মারিতে সাহস করিতেন না, পাছে লোক ছুটিয়া আইসে, এই ভয়।

গুরুমহাশয় নিজের কোষ্ঠীর লিখন মত, বালকদিগকে পানটা, তামাকটা, পয়সাটা চুরি করিয়া আনিতে উপদেশ দিতেন। যাহারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত, গুরুমহাশয় তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। আর যাহারা চুরি করিতে না পারিত, তাহাদের আর রক্ষা থাকিত না; তাহাদের পিঠে ভাদ্র মাসের তাল ত পড়িতই, তা ছাড়া বেত্রাঘাতে পিঠ দড়া দড়া হইয়া যাইত। কিন্তু হরিদাসের উৎকট উচ্চ আর্ত্তনাদ মাসের মধ্যে অধিক দিন শুনা যাইত না। বিপ্রদাসের বিকট মুখভঙ্গি দর্শনে ও প্রহারের তাড়নে হরিদাস এমন অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিল যে, প্রহারে আর সে ভয় পাইত না। গুরুমহাশয়ও হরিদাসকে প্রহার করিতে আক্লান্ত হইতেন না। প্রহারের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল, আর হরিদাস গুরুমহাশয়কে জব্দ করিবার উপায় দেখিতে লাগিল।

হরিদাস একদিন বাড়ী হইতে একখানা আমসত্ব আনিয়া গুরু-মহাশয়কে দিল, বলিল,—

"ঘরে তৈরি হ'য়েচে, আমি লুকিয়ে আপনার জন্যে এনেচি।"

বিপ্রদাস আমসত্ব বড় ভাল বাসিতেন। বিশেষ ঘরে তৈয়ারী আমসত্ব বাজারের আমসত্ব অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট; সুতরাং গৃহে প্রস্তুত আমসত্ব পাইয়া তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন, আহ্লাদ দেখে কে? আর এক কথা, হরিদাসের নিকট হইতে তিনি পূর্ব্বে কখন কিছু পান নাই, এই কারণে হরিদাস অনেক সময়ে মার খাইত, আজ সেই হরিদাস তাঁহার জন্য আমসত্ব চুরি করিয়া আনিয়াছে, ইহার অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? গুরুমহাশয় হরিদাসকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, আরও দুই চারি খানা চুরি করিয়া আনিতে উপদেশ দিলেন। সে দিন হরিদাসের আদরের সীমা ছিল না। যে সকল বালক হরিদাসের বিপক্ষে গুরু মহাশয়ের নিকট নালিশ তুলিল, বেত্রাঘাতে সে দিন তাহাদের পিঠ ভাঙ্গিল। গুরুমহাশয়ের আদর দেখিয়া হরিদাস মনে মনে হাসিতে লাগিল।

পরদিন গুরুমহাশয়ের সে শান্ত-সৌম্য-মূর্ত্তি আর নাই। চক্ষু দুইটি জবা ফুলের মত লাল, ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া তিনি পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সকল বালক থর থর কাঁপিতে লাগিল, আজ আর কাহারও নিস্তার নাই ভাবিয়া প্রমাদ গণিল।

গুরুমহাশয় পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া সজোরে কয়েকবার ভূতলে বেত্রাঘাত করিলেন ; সিংহনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"হতভাগা পাজী বদমায়েস একবার এলে হয় ।"

ক্রোধান্ধ গুরুমহাশয় অস্থির হইয়া বেত্রহস্তে পাঠশালার অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হরিদাসকে আসিতে না দেখিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—

"কেষ্টা, পড়া দিয়ে যা ।"

কৃষ্ণচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে গুরু মহাশয়ের সম্মুখীন হইল, কম্পিত-স্বরে পড়িতে লাগিল,—

"একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল ।"

সক্রোধে বিকট চীৎকার করিয়া বেত্র নাচাইতে নাচাইতে গুরুমহাশয় বলিলেন,—

"পাজী, গাধা, হারামজাদ, দেখে পড়্ ।"

গুরুমহাশয়ের মূর্ত্তি দেখিয়াই বালকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সেই সিংহনাদ শ্রবণে ও প্রহারের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, বেত্র-দণ্ডের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সে আবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িতে লাগিল,—

"একদা এক বাপের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল ।"

"গুরুমহাশয় একে রাগিয়াছিলেন, তাহার উপর কৃষ্ণচন্দ্রের পাঠে ভুল হওয়ায় রাগের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল, ভাঁটার মত রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া গালি পাড়িয়া বলিলেন,—

"আঁটকুড়ির ছাগল, বাপের গলায় কিরে, চোক নেই—"প" না "গ"? বলিয়া বেত্রাঘাত করিলেন। বামহস্তে নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্র ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল,—

"প"—"প"—"প"।

গুরুমহাশয় বেত্রোত্তলন করিয়া পুনরায় যেমন মারিতে যাইবেন, এমন সময়ে হরিদাস প্রবেশ করিল। দূর হইতে গুরু মহাশয়ের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া হরিদাস হাসিতেছিল। যখন নিকট-বর্ত্তী হইল, তখন অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল। কেহ যদি সে দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, হরিদাস পাঁচ সাতটা জামা গায়ে দিয়া বর্ম্মাচ্ছাদিত বীরপুরুষের মত সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে।

দর্শনমাত্র গুরু মহাশয় দৌড়িয়া গিয়া সজোরে হরিদাসের হাত চাপিয়া ধরিলেন। যথাস্থানে টানিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন,—

"হাঁরে হরে, আমসত্ত্ব কোথায় পেয়েছিলি ঠিক করে বল্?"

গুরুমহাশয়ের সে বিকট মূর্ত্তি দর্শন ও বজ্রনাদ শ্রবণ করিয়াও হরিদাসের মুখের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সে অম্লান বদনে বলিল,—

"মা ঘরে করেচে।"

গুরুমহাশয়ের বিশ্বাস হইল না; রাগ আরও বাড়িয়া গেল, স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন,—

আমার কাছে মিছে কথা ! তোর মা আমসত্ব করেছে ! মিথ্যা-বাদী—পাজী—বদমাস !"

ভীম-মূর্ত্তি বিপ্রদাসের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়াও হরিদাসের কোন রূপ ভয়ের লক্ষণ দেখা দিল না, সে বলিল,—

"হাঁ সত্যি বল্‌চি, মা নিজের হাতে করেচে।"

বিপ্র। তোর মিছে কথা। তুই বড় মিথ্যাবাদী। তোরই ঐ কাণ্ড, তুই করেছিস্।

হরি। আমি কিছুই জানি নি।

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বার কতক মাটীতে বেত্রদণ্ড ঠুকিয়া ঠুকিয়া, ভাঁটার মত রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় অধিকতর রক্তবর্ণ করিয়া, বিপ্রদাস বলিলেন,—

"তোর মা আমসত্বে চামড়া দিতে গেছে !"

চামড়ার কথা শুনিয়া,হরিদাস যেন আকাশ হইতে পড়িল,বলিল,—"চামড়া কি গুরুমহাশয়, আমসত্বে চামড়া কি ?"

বিপ্রদাসের রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। অন্য বালক হইলে অনেক পূর্ব্বে তাহার পিঠ ফাটিত ; কিন্তু গুরুমহাশয় হরিদাসকে বিশেষ চিনিয়াছিলেন, প্রহারে কোন কথা বাহির করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, তাই এতক্ষণ হরিদাসের পিঠে বেত পড়ে নাই ; অপর ছাত্র হইলে প্রহারে তিনি সকল কথা বাহির করিয়া লইতেন, হরিদাসের মুখে সত্য কথা বাহির করিতে পারিবেন না বুঝিয়া তিনি সরোষে বলিলেন,—

"বদমাস্! তুই কিছু জানিস্ না! আমার কাছে ন্যাকামি! এখনও বল্, তা না হ'লে এই বেত তোর পিঠে ভাঙ্গব।"

এই বলিয়া শাসাইয়া গুরুমহাশয় সেই বেত গাছটি হরিদাসের পিঠের উপর নাচাইতে লাগিলেন।

হরিদাস তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল,—

"আমি কিছুই জানি না।"

তথাপি বিপ্রদাসের সন্দেহ গেল না, তিনি বলিলেন,—

"তবে তোর মাকে জিজ্ঞেস্ কত্তে পাঠাই?"

এইবার হরিদাসের মুখ শুকাইল; কিন্তু চকিতে ভয় সম্বরণ করিয়া সতেজে বলিল,—

"হাঁ, সচ্চন্দে পাঠান।"

হরিদাস যে সময়ে গুরুমহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর করিতেছিল, সেই সময়ে যদি কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, হরিদাস গুরুমহাশয়ের কথার উত্তর দিবার সময় আড়-নয়নে এদিক ওদিক চাহিতেছে; অভিপ্রায় গুরুমহাশয় এক ঘা বেত মারিলেই একেবারে চম্পট দিবে।

যে সময়ে বিপ্রদাস ও হরিদাসের এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে-ছিল, সেই সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—

"ব্যাপার বড় ভয়ানক! কাল এই ছোঁড়াটা আমাকে এক-

খানা আমসত্ব দিয়া বলিয়াছিল, ঘরে তৈয়ারী আমসত্ব। আমি ঘরে গিয়া খাবার সময় গরম দুধে সেই আমসত্ত্বের একখণ্ড ফেলিয়া দিলাম। মনে করিলাম, আজ খাওয়াটা হবে ভাল। কিন্তু পরে দেখি, আমসত্ত্বের ভিতর কুঁচ কুঁচ চামড়া! ভাবুন দেখি, হতভাগার কি আক্কেল খানা! জিজ্ঞেস কর্‌লে বলে কি না, মা করেচে। কাজ ওরই; বেটারছেলেকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ালেও রাগ যায় না।"

বলিতে বলিতে বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিলেন। ভদ্রলোকটীও আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে গুরুমহাশয়ের হাস্য-রোল অধিক উচ্চ হইয়া উঠিল। গুরুমহাশয় খুব জব্দ হইয়াছেন জানিয়া সকল বালক খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিদাস সেই অবসরে একেবারে দৌড়।

গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে হরিদাসের পিছু পিছু ছুটিলেন, ধরিতে পারিলেন না; হরিদাস লম্বা লম্বা পায়ে, দুই চারি লাফে, অদৃশ্য হইয়া গেল। গুরুমহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় উল্লাস।

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।
তাই বলি মন বুঝে চল॥"

এই ঘটনার পর হইতে হরিদাস পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করিল। গোবিন্দ পুত্রকে পাঠশালায় না যাইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হরিদাস বলিল, "আমি ও পাঠশালায় যা'ব না, গুরু-মশায় বড্ড মারে।" গোবিন্দ ছেলেকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। হরিদাস পূর্ব্বেই তার মাকে হাত করিয়া রাখিয়াছিল। গুরুমহাশয় চুরি করিতে শিখায়। পান, তামাক, পয়সা চুরি করিয়া গুরু-মহাশয়কে না দিলে, তিনি অতিশয় প্রহার করেন। এইরূপ দুই একটা সত্যের মধ্যে অনেক মিথ্যা ডাল পালা দিয়া তার মাকে বেশ বুঝাইয়াছিল যে, গুরুমহাশয় বড় বদলোক, ও পাঠশালায় যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং গোবিন্দ যখন হরিদাসকে তাড়না করিতেছিল, তখন হরিদাসের মা পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল,—

"ও পাঠশালে আবার ভদ্রলোকে ছেলে পাঠায়! এ কোথাকার গুরু, ছেলেকে চুরি কত্তে শেখায়! বাছা পয়সা দেয় না ব'লে

বাছাকে মেরে মেরে আধমরা করে! সে কি গুরু? তুমি ত কিছু খবর রাখ না, ছেলেকে বক্‌লেই হ'ল, বুড়ো হ'লে মতিচ্ছন্ন দশাই ধরে। আর লেখা পড়া শিখে কাজ নেই, সাট্‌ সাট্‌ যেঠের বাচ্ছা আমার বেঁচে থাক্‌। বেঁচে থাক্‌লে ঢের রোজ-গার কর্‌বে।"

স্ত্রীর উপর কথা কয়, বৃদ্ধ গোবিন্দের সে সাহস ছিল না, সে তখন থতমত খাইয়া বলিল, "যা খুসি তাই কর্‌গে যা!"

আর কোন কথা না বলিয়া, গোবিন্দ বারিক দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল। সেই অবধি হরিদাস সাপের পাঁচ পা দেখিল। তাড়িপাত সিকেয় উঠিল। কাজ-কর্ম্ম নাই, পড়া-শুনা নাই, বদমাস ছেলেদের সঙ্গে হরিদাস কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে অনেক সঙ্গী জুটিল।

হরিদাস তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, বয়স ষোড়শ বর্ষ। বদমায়েস লোকের সঙ্গে মিশিলে, যে দোষ ঘটে, হরিদাসের তাহাই ঘটিল। পাঠশালায় পড়িবার সময় হরিদাস দুই একটান তামাক খাইতে শিখিয়াছিল। গুরুমহাশয় তামাক সাজিতে বলিলে, তামাক ধরাইয়া কলিকায় দুই চারিটান না টানিয়া হরিদাস কদাচ তাজা কলিকা গুরুমহাশয়কে দিত না; সেইখানেই তাহার তামাকের হাতে-খড়ি হইয়াছিল। নেশাখোর বদমায়েস দলে মিশিয়া হরিদাস ক্রমে ক্রমে সব রকম নেশা ধরিল। প্রধান হইল মদ। জিনিষটি গর্ভে প্রবেশ করিয়া শান্ত হইয়া বসিয়া থাকে না,

স্রোত বাড়াইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। মদের প্রভাবে ও ইয়ারের কুহকে হরিদাস বেশ্যাসক্ত হইল। বাল্যাবস্থায় হরিদাস দুষ্টামীতে অগ্রণী ছিল, এক্ষণে নষ্টামীতেও অগ্রণী হইয়া উঠিল।

দৈবাৎ গোবিন্দ বারিক হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিল, সংসারের সমুদায় ভার হরিদাসের উপর পড়িল,—হরিদাসের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হরিদাস যাহা কখন ভাবে নাই, যাহা কখন করে নাই, আজ তাহাকে তাহাই ভাবিতে, তাহাই করিতে বাধ্য হইতে হইল।

বৃদ্ধ গোবিন্দ ভাঁড় হাতে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তেল বেচিয়া বেড়াইত, তাহাতেই এক রকমে সংসার চলিত। হরিদাস যদি তাহা না করে, তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়িবে, সুতরাং বাধ্য হইয়া হরিদাসকে তাহাই করিতে হইল,—ভাঁড় হাতে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তেল বেচিতে হইল। হরিদাসের কষ্টের আর সীমা রহিল না।

কোথায় সে ইয়ার-বর্গের সঙ্গে বিলাস-মন্দিরে বিলাসিনীদের চাঁদ-মুখ দেখিবে, না রাত পোহাতে না পোহাতে তেলের ভাঁড় হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইবে, এও সে কি পারে? হরিদাসের বড়ই কষ্ট, বড়ই লজ্জা, বড়ই ক্ষোভ; ক্ষোভে দুঃখে হরিদাসের দেহ-যষ্টি খানি একেবারে কালিবর্ণ ধারণ করিল, দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

ভাঁড় হাতে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তেল বেচিয়া বেড়ানই হরিদাসের প্রধান কষ্টের কারণ। তাহার প্রাণে এখন সখ

বিঁধিয়াছে, সে এখন পাঁচজন সৌখীন লোকের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু পারে না, কোন ভদ্র লোকের সন্তান তাহার ত্রিসীমা মাড়ায় না, নিকটেও ঘেঁসিতে দেয় না। যে সকল বারাঙ্গনার গৃহে ভদ্রলোক যাতায়াত করে, সে সকল ঘরে হরিদাস স্থান পায় না। সে যদি দৈবাৎ সেই রকমের কোন বেশ্যার ঘরে উপস্থিত হয়, তাহাকে দেখিবামাত্র ভদ্র লোকেরা এক একটা অছিলা করিয়া উঠিয়া যায়। হরিদাস তাহা বুঝিতে পারে, অপমানের সীমা থাকে না।

এই সকল কারণে হরিদাস পাড়ায় পাড়ায় তেল বেচা বন্ধ করিল। বৃদ্ধ গোবিন্দ যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, বাবু-গিরি করিয়া হরিদাস ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্তই খোয়াইল। ক্রমে ঘানীগাছ ও ঘানীর গরু বিক্রয় করিতে হইল। বৃদ্ধা মাতা কত বুঝাইল, কিন্তু হরিদাস তাহা শুনিল না।

হরিদাস তখন বেশ্যাতে ও মদিরাতে উন্মত্ত, মায়ের উপদেশ সে শুনিবে কেন? বুড়ী এ পাড়া ওপাড়া হইতে ভিক্ষা করিয়া সংসার চালায়, দুর্গতির অবধি রহিল না! চোখের জলে বৃদ্ধার বুক ভাসিয়া যায়, হরিদাস তাহা দেখিয়াও দেখে না।

বেশ্যা-মহলে যাতায়াত করিয়া হরিদাসের মতিগতি এতদূর উন্নত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে একদিন বাজার করিয়া আসিতে আসিতে দেখিল যে, বারান্দায় তাহার পরিচিত এক বারবিলাসিনী দাঁড়াইয়া আছে। হাতে বাজার দেখিয়া পাছে প্রেমিকা হেয়জ্ঞান

করে, সেই ভয়ে হরিদাস সে বাজারের জিনিষগুলি পাশের একটা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল; বাবু সাজিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিল; খানিকক্ষণ বিলাসিনীর সহিত প্রেমালাপ করিয়া, পরিশেষে রিক্ত-হস্তে বাড়ীতে ফিরিল। পুত্রকে শূন্য হস্তে ফিরিতে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিল,—

"অ হরি! বাজার কোথায়? বাজার এলে তবে রান্না চড়বে, ঘরে কিছুই নেই। বাজার কোথায় রেখে এলি?"

হরিদাস গাঁই গুঁই করিয়া সারিয়া দিল; বার বার জননীর ঐরূপ প্রশ্নে শেষ কালে রাগিয়া উঠিল।

হরিদাসের মা মনের কষ্টে খানিক ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল, তার পর চোখের জল মুছিয়া, পাড়া হইতে চাল-ডাল মাগিয়া আনিয়া সে দিনের মত উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

বিধবা হইয়া অবধি, অভাগিণী বৃদ্ধা একপ্রকার উন্মাদিনী হইয়াছিল; তাহার উপর ছেলের ঐ রকম দৌরাত্ম্য; ক্রমাগত ইহা দেখিয়া দেখিয়া বুড়ী একেবারে জ্ঞান-হারা হইল; ভাবনায় ভাবনায় জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। অবশেষে মৃত্যু-শয্যা-শায়িনী। অল্প দিন মধ্যেই দয়াময় কৃতান্ত সেই দুঃখিনী বিধবার ইহ সংসারের সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিলেন। বুড়ী মরিল।—মরিল কি বাঁচিল, সেই অবস্থার লোকেরাই তাহা বুঝেন।

চতুর্থ উল্লাস।

"খাবে এস মধুসূদন।
খাবি আয়রে মেধো॥"

হরিদাসের বাপ মারা গেল, মা মারা গেল, টাকা কড়ি যা কিছু ছিল, তাহাও ফুরাইয়া গেল; সামান্য যে একটু পৈত্রিক বসত বাটী ছিল, তাহাও বিকাইয়া গেল, তবু হরিদাসের বাবু-গিরি গেল না। হরিদাস যে বাবু সেই বাবু! চৈতন্য হইল না! সাবেক বাটীর তফাতে ছোট একখানা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া হরিদাস এক একদিন সেই খানেই বাস করিতে লাগিল।

বেশ্যা মহলে হরিদাসের কিছু কিছু নাম-ডাক হইয়াছিল; কলু নামটা অনেক ঢাকিয়া গিয়াছিল। অনেক বাবু ভায়া, যাঁহারা বেশ্যার দরজায় দরজায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বেশ্যার ঝাঁটা খাইতেন, অথচ গুমরে মাটিতে পা দিতেন না, যাঁহারা যে বেশ্যার ঘরে বসিতেন, সে ঘরে হরিদাস ঢুকিলে আপনাদিগকে মহা অবমানিত বোধ করিতেন, হরিদাসের বাবু-গিরিতে সেই রকমের বাবু ভায়াদের দর্প, চূর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাঁহারা দেখিলেন,

হরিদাসের সঙ্গে মিশিলে বেশ দু পয়সা ত লভ্য আছেই, তা ছাড়া মদের ছড়াছড়ি।

প্রশ্ন হইতে পারে তত দুঃখের দশায় হরিদাসের বাবু-গিরির খরচা কোথা হইতে যোটে ?

উত্তর এই যে, বাড়ী বিক্রয়ের টাকাগুলি তাহার হাতে ছিল, আর কিছু কিছু গুপ্ত রোজগারও ছিল; তাহাতেই দিন কতক খুব নপর-চপর।

হরিদাস যে মেয়ে-মানুষের ঘরে ঢুকে, সে ঘরে একরাত্রে কুড়ি পঁচিশ টাকা খরচ করে, মদের সদাব্রত বসে। পূর্ব্ব কথিত ইয়ার বাবুরা ভাবিলেন, "হরিদাসের দলের লোকেরা মজা'টা মারে ভাল, কেবল আমরাই ফাঁক পড়িয়া যাই!" ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহাদের আপ্‌সোষের আর সীমা থাকে না।

এদিকে হরিদাসের শিরে-সংক্রান্তি! টাকাগুলি ফুরাইয়া আসিল, বাবু-গিরিতে মান-ইজ্জত যাহা কিছু অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহাও প্রায় লোপ পায়। শুধু লম্বা টেরি, লম্বা কোঁচা, লম্বা চওড়া মুখ হইলেই ত বেশ্যা ভোলে না; সেই রকম লম্বা চওড়া টাকা চাই। হরিদাসের তখন সে দফায় অষ্ট-রম্ভা! গরীবের ছেলে নিত্য নিত্য তত টাকা পায় কোথা? যত দিন ছিল, তত দিন ত লম্বা লম্বা খরচ ক'রে ফুঁকে দিয়েছে, আর পায় কোথা?

হরিদাসের ভাবনা আসিয়া জুটিল। হরিদাস মনে করিল, "যদি আমার হাতে টাকা থাক্‌তো, তা হ'লে বেশ্যা মহলে বাবু-গিরি

কা'কে বলে তা একবার দেখাতেম! হরে কলুর বুকের পাটা কত বড়, তা একবার দেখিয়ে দিতেম।"

হরিদাসের দুঃখের ভাবনা, আকাশের দেবতাদের কানে গিয়া পৌছিল। রাতারাতি হরিদাসের কপাল ধরিল। বহুবাজারে হরিদাসের এক দিদিমা ছিল, হঠাৎ সেই দিদিমার মৃত্যু হইল, তাহার বিপুল সম্পত্তি ছিল, হরিদাস সেই যাবতীয় ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইল। সে অধিকার তাহার হস্তে আসিবে, হরিদাস ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

হরিদাস বহু ধনের মালিক হইল, দিদিমার, বহুবাজারের অট্টালিকার অধিকারী হইল, সে আর তখন তেল-বেচা হরে কলু রহিল না, অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মান-সভ্রম খাতির-প্রতিপত্তি উচ্চ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। এখন সে যাহার সঙ্গে কথা কয়, আলাপ করে, সে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে।

ভাড়া-করা খোলার ঘর ছাড়িয়া দিয়া হরিদাস তখন বহু বাজারের বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল। দিদিমার যে সকল পুরাতন দাস দাসী ছিল, তাহাদের অনেককে বিদায় করিয়া দিল, যাহারা হরিদাসের মন যোগাইয়া চলিল, তাহারাই থাকিতে পাইল।

হরিদাসের বিবাহ হয় নাই। ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি অন্য পরিবারও কেহ ছিল না, সুতরাং অত বড় বাড়ীতে হরিদাস একাকী, সঙ্গী কেবল অপর লোক; বাড়ীখানা যেন হাঁ হাঁ খাঁ খাঁ করে।

হরিদাস পূর্ব্বে ভাবিত, টাকা পাইলেই মানুষ সুখী হয়, কিন্তু বিষয় পাইয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। ভাবনা আরও বাড়িল, সে ভাবিতে লাগিল, বিষয়-আশয় দেখিবে কে.? খাজনা পত্র আদায় করিবে কে ? হিসাব পত্র রাখিবে কে ? এত ঝামাল পোহাইবে কে ?

যে সম্পত্তি হরিদাসের হস্তগত হইল, তাহার মাসিক আয় প্রায় চারি হাজার টাকা। তত টাকার হিসাব পত্র কাহার জিম্মায় থাকিবে, এই ভাবনায় হরিদাস মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। কথায় বলে "ঘোড়া হলেই চাবুক হয়, বিষয় হলেই ব্যবস্থা হয়!" প্রথম প্রথম হরিদাসের একটু অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু দিদিমার পুরাতন কর্ম্মচারীরা হরিদাসের মনোরঞ্জনের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ-কর্ম্ম করিতে লাগিল। হরিদাসের ভাবনা দূর হইল। হরিদাস বেশ বুঝিল, কেহ কিছুই করে না, সময়ের গুণে, অদৃষ্টের গুণে, কাজ আপনি চলিয়া যায়। হরিদাসের অদৃষ্টের গুণে, সরকার, গোমস্তা, দ্বারবান, চাকর, চাকরাণী, সব মিলিয়া গেল ভাল; জলের মত চারিদিক হইতে টাকা কড়ি আসিয়া পড়িতে লাগিল। বলিতে কি, যে হরিদাস কখন এক সঙ্গে এক হাজার টাকা দেখিয়াছে কি না সন্দেহ, সেই হরিদাসের হাতে মাসে মাসে চার পাঁচ হাজার টাকা। ভগবানের লীলা কে বুঝিবে? হরিদাসের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

ইদানিং হরিদাসের বাবু-গিরির ঘটা পূর্ণমাত্রায় ছাপাইয়া উঠিল। লম্বা লম্বা খরচ, লম্বা লম্বা খয়রাৎ, লম্বা লম্বা বক্‌সিস্, এক টাকার

স্থলে দশ টাকা, দশ টাকার স্থলে একশ টাকা, একশ টাকার স্থলে হাজার টাকা! পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দশ গুণ! হরিদাসের অপেক্ষা বড় দরের লোক যাহা খরচ করিতে সাহসী না হইতেন, হরিদাস তাঁহাদের উপর টেক্কা দিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ খরচ করিয়া বেশ্যা-মহলে খুব বাহাদুরি লইতে আরম্ভ করিল।

হরিদাসের রক্ষিতা বিলাসিনীর নাম হেমাঙ্গিনী। হরিদাসের সৌভাগ্যোদয়ে হেমাঙ্গিনীর সুখের সীমা রহিল না। হেমাঙ্গিনী হরিদাসকে পূর্ব্ব হইতে এক প্রকার বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিল, এক্ষণে হরিদাসের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যবাধকতা ও আদর-যত্নের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, মায়াবিনীর মায়া কান্না বাড়িল।

হরিদাস এক্ষণে পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, হেমাঙ্গিনী অষ্টাদশী, যৌবন ভারে টল টল, ঢল ঢল। যৌবনে কুক্কুরীও সুন্দরী, সুন্দরী হেমাঙ্গিনী ত অধিক সুন্দরী হইবেই। তার উপর হেমাঙ্গিনী গৌরাঙ্গী; কটা চামড়ার আদর চিরকালই আছে। নাকটি চেপ্টাও নয়, বাঁশীর মতও নয়, মাঝামাঝি; চোক দুটি ডাগর ডাগর; দাঁতগুলি মুক্তার মত, কপাল ছোট; এত রূপ, টাকার পালিসে সেই রূপ আরও মার্জ্জিত। হেমাঙ্গিনীর গলার স্বর বড় মিঠা; হেমাঙ্গিনী গাইতে জানে, আপন হাতে ঠেকা দিতে জানে, একটু একটু নাচতেও জানে। হেমাঙ্গিনীর এতগুলি গুণ ছিল। নাম জাদা বেশ্যা হইতে হইলে, যে সকল গুণের দরকার, হেমাঙ্গিনীর সে সকল গুণও কিছু কিছু ছিল।

হেমাঙ্গিনীর কথায় হরিদাস উঠিত বসিত। হেমাঙ্গিনী নিজের পথ নিজে বেশ চিনিতে শিখিয়াছে। ইহার উপর তার মার পরামর্শ আছে, সোনায় সোহাগা। মাতার পরামর্শ শুনিয়া হেমাঙ্গিনী সদাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করে,—আজ এ জিনিষটা, কাল ও জিনিবটা, আজ এ গহনা, কাল ও গহনা, এই রকম রোজই একটা না একটা বায়না ধরে। হরিদাস হেমাঙ্গিনীর প্রেমে মজিয়াছে, হেমাঙ্গিনীকে এক দণ্ড বিমর্ষ দেখিলে হরিদাস জগৎ সংসার-শূন্যময় দেখে। হেমাঙ্গিনীর চক্ষে জল দেখিলে হরিদাসের আত্মা-পুরুষ কম্পিত হইয়া উঠে, সুতরাং হেমাঙ্গিনীর আব্দার পূর্ণ হইতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। অতি অল্পদিনের মধ্যে হেমাঙ্গিনী অনেক টাকা আদায় করিয়া লইল। হেমাঙ্গিনীর কিছুই ছিল না, এক্ষণে এক গা গহনা, গৃহে সুন্দর সুন্দর আসবাব; দেরাজ, আলমায়রা, চেয়ার, টেবিল, খট্টা, ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, দিশি বিলাতী নানা রকম ছবি, বুককেস, রূপার বড় বড় আয়না, পিক্‌দান, রূপার বাটা ইত্যাদি কত বলিব, গৃহস্থলী ও সৌখিন যাবদীয় দ্রব্য আদরিণী বিলাসিনী সচ্ছন্দে হরিদাসের ঘাড় হইতে আদায় করিয়া লইল। তা ছাড়া, হেমাঙ্গিনীর হাতে এখন নগদ মজুত পঞ্চাশ হাজার টাকা।

হেমাঙ্গিনীর গৃহে দিনরাত নাচ গান, দিনরাত মদের তুফান, মধু-লোলুপ মক্ষিকার ন্যায় দলে দলে মাতাল আসিয়া জুটিল,—হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার!

প্রথম উল্লাসে যে চারিজন মোসাহেবের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারাই যে হরিদাসের একের নম্বর মোসাহেব, তাহা আর পাঠককে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই সকল মোসাহেবের কার্য্যের পরিচয় আবশ্যক বোধে নিম্নে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা গেল।

প্রথম মটুকচন্দ্র পাল, ডাকনাম কুঁজো মটুকো। দ্বিতীয় সাতকড়ি রায়,—চশমা ব্যবহার করিত বলিয়া, ডাক-নাম কানা সাতকড়ে। তৃতীয় ভূতনাথ সিংহ, একটু নেংচে চলিত বলিয়া ডাক-নাম খোঁড়া ভূতো। চতুর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক-নাম—কটা দেবা, গুণ্ডা দেবা এবং চুয়াড়ে দেবা। দেবেন খুব মার খাইতে পারে, চেহারাটা চুয়াড়ে চুয়াড়ে গুণ্ডার মত, চোক ছুটি কটা, তাই উহার ঐ তিন উপাধি।

তাহারা হরিদাসের এমন ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল যে, হরিদাস তাহাদিগকে বিস্তর অবমান করিলেও, জুতালাথি মারিলেও, তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। হরিদাসকে হেমাঙ্গিনীর প্রেমে মজাইবার ইহারাই প্রধান ঘটক। তাহাদিগের দ্বারাই হরিদাসের ফটিক চাঁদ নামকরণ হইয়াছিল। আমরাও গালাগালির হাত এড়াইবার জন্য হরিদাসকে প্রথম উল্লাসের সেই মোসাহেবি আদুরে নামে ‘ফটিক চাঁদ’ বলিয়া পরিচয় দিব।

পঞ্চম উল্লাস।

"সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি।
চুল ঝাড়টা মুড়িয়ে আয় তেল পলাটা দি॥"

মাই ডিয়ার?

কোন উত্তর নাই।

ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

"মাই ডিয়ার? একটা উত্তর দাও।"

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল।

ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"মান করেছ, বেশ করেছ, কালাচাঁদকে কাঁদিয়ে দেছ, এখন একটী গান গাও?"

হেমাঙ্গিনী গর্জ্জিয়া উঠিল, ফটিকের হাতখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কর্কশ স্বরে বলিল,—

"যাও যাও আর সোহাগ জানাতে হ'বে না।"

ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর দুই পা দুই হাতে নিজের মাথায় রাখিয়া বলিলেন,—

"তব শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি মাই ডিয়ার?"

হেমাঙ্গিনীর আদর বাড়িয়া গেল, অল্প নাকি স্বরে বলিল,—

"যেখানে ছিলে সেইখানে থাকগে। তোমার থাকবার জায়গার অভাব কি? আমার মতন ত নিক্ষেমতার লোক নও।"

ফটিক। মাইরি বল্‌চি মাই ডিয়ার, কোথাও আমি যাই নি, বাড়ীতেই ব'সে ছিলুম।

হেমা। মিছে কথার জড়।

ফটিক। সত্যি বল্‌চি, মাইরি বল্‌চি, তোর পা ছুঁয়ে বল্‌চি, বাড়ীতেই ছিলুম।

হেমা। বাড়ীতে একটা কেড়েছ বুঝি?

ফটিক চাঁদ মুস্কিলে পড়িলেন, সাফাই দিয়া বলিলেন,—

"পাঁচটি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছেলো, তাঁদের খাওয়াতে দাওয়াতে একটু দেরি হয়েছে, দশটার জায়গায় বারোটা বেজেছে, এতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে!"

যেন কতই ভালবাসে, যেন একদণ্ড না দেখিলে প্রাণ ছট্ ফট্ করে, সেইরূপ ভাণ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"তোমার কাছে ভদ্রলোক সবাই, কুঁজো মট্‌কো, একজন ভদ্রলোক; কানা সাতকড়ে, সেও একজন ভদ্রলোক; খোঁড়া ভূতো, শুঁড়ীর দোকানে ব'সে মদ খায়, সেও তোমার কাছে ভদ্রলোক; আর কটা দেবা,—বাবা নমস্কার, তেমন ভদ্রলোক আর দুটী নেই, যেমন দেখ্‌তে চুয়াড়ে, কথাও চুয়াড়ে, কাজেও চুয়াড়ে। কথায় বলে,—

"কাল বামুন কটা শূদ্দুর বেঁটে মুছুরমান।
ঘর জামাই আর পুষ্যি পুত্তুর পাঁচ বেটাই সমান॥"

মোসাহেবদের নিন্দা ফটিক চাঁদের কানে ভাল লাগিল না, অথচ নিন্দা খণ্ডন করিতেও সাহস হইল না, ভয়ে ভয়ে তিনি বলিলেন,—

"ওদের ওপর এত রাগ কেন?"

হেমাঙ্গিনীর আরও জোর বাড়িয়া গেল, চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—

"জন্ম জন্ম ওদের ভালবাস্‌তে থাক; জন্ম জন্ম ওরা তোমার ঘটকালী করুক, জন্ম জন্ম ওরা তোমার মাথায় কাঁটাল ভেঙে থাক্‌। বেশত যেখানে ভাল বুঝবে থাক্‌বে। আমি ত আর তোমার মন্তর-পড়া মাগ নই যে, তোমার উপর আমার জোর খাটবে?"

ফটিক। দেখ্‌তে পাচ্চত, লোকে নিজের স্ত্রীকে যত না যত্ন করে, আমি তার চেয়ে ঢের বেশী তোমায় যত্ন করি।

হেমাঙ্গিনী মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইল; সে ভাব গোপন করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল,—

"বোল্‌তে একটু লজ্জাও হ'ল না; বিয়ে করা মাগ হ'লে এ রকম করে, এত রাত পর্য্যন্ত একলা ফেলে কখনই থাক্‌তে পার্‌তে না।"

"কতক্ষণই বা থেকেচি? বড় জোর ঢু ঘণ্টা। অন্য জায়গায় যদি থাক্‌তুম, তা হ'লে মুখে গন্ধ থাকত ত? শুঁকে দেখ্‌দেখি আমার মুখ খানা? বড্ড গন্ধ, ভুর্‌ ভুর্‌ কচ্চে!" এই বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া রসিক ফটিক চাঁদ, হাঁ

করিয়া হাই দিয়া বলিলেন,—"দেখ্‌দেখি সে রকম গন্ধ আছে কি ?"

হেমা। মদ নাই বা খেলে, মদ না খেয়ে কি ইয়ারকি হয় না ?

ফটিক। এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে নাচার !

ফটিক চাঁদ আরও কিছু বলিতে যাইতে ছিলেন। এমন সময়ে হেমাঙ্গিনীর মাতা থাকমণি, বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—

"অ হিমু, বামুন ঠাকুর খাবার নিয়ে এসেছে, কোথায় রাখ্‌বে ?"

হেমাঙ্গিনী উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—

"এই ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

ফটিক চাঁদের পাচক ব্রাহ্মণ বড় থালে করিয়া লুচি, তরকারি মাংস, চাট্‌নি, মোণ্ডা, রসগোল্লা, ক্ষীর, দধি ইত্যাদি হেমাঙ্গিনীর ঘরে রাখিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনীর দুই হাত ধরিয়া ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"এইবার বিশ্বাস হ'ল ত মাই ডিয়ার ?"

মুখ ভারি করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"দেখ, আমায় জ্বলিও না বল্‌চি; এখনই ও গুলো সব উল্টে পাল্টে দূর্ করে টেনে ফেলে দোবো।"

এই কথা বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া খাবারের থালার দিকে ছুটিল।

ফটিক চাঁদ পাছু পাছু ছুটিলেন, দ্রুত-ধাবিতা উগ্রচণ্ডিকা হেমাঙ্গিনীকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—

"ছিঃ ছিঃ কি করিস্‌ !"

হেমাঙ্গিনীর আদর আরও বাড়িয়া গেল, বলিল,—

"ছাড়্ বল্‌চি, ছেড়েদে, আমি এখনই মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হ'বো।"

হেমাঙ্গিনীকে মাথায় না তুলিয়া ফটিক চাঁদ যদি তাহার দুই গালে চার চড় বসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে এ ঝগড়া অনেক কাল মিটিয়া যাইত; কিন্তু ফটিক চাঁদের ভালবাসা ও মিষ্ট কথাই এত অনর্থ বাধাইল; মায়াবিনী হেমাঙ্গিনীর উন্মত্ততা দেখিয়া ফটিক চাঁদের ভয় হইল, উচ্চকণ্ঠে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিলেন।

পাশের ঘর হইতে হেমাঙ্গিনীর মা ছুটিয়া আসিল,—জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেন বাবা, কি হয়েছে?"

ফটিক চাঁদ ভয়-বিহ্বল স্বরে বলিলেন,—

"আপনার মেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, খাবারগুলি ফেলে দিতে যাচ্ছে, আপনি আপনার মেয়েকে শান্ত করুন, আমি ত পেরে উঠ্‌চি না।"

হেমাঙ্গিনীর মা খুব মোটা, খর্ব্বকায়, বয়স সাড়ে তিন কুড়ি বৎসর, থপ্ থপ্ করিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হইল, ভাব গতিক দেখিয়া মনে মনে বলিল, "বিষ ধরেচে" থমকিয়া দাঁড়াইল, ফটিক চাঁদকে ভৎ'সনাচ্ছলে বলিল, "জানইত বাবা, মেয়েটা বড় দুষ্ট, একটু সকাল সকাল এলেই ত ভাল হয়।"

হেমাঙ্গিনী তখন ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল। বুড়ীর দিকে চাহিয়া ফটিক চাঁদ বলিতে লাগিলেন,—

"মা, আপনি ত দেখ্‌চেন আমি কোথাও যাই নি। পাছে আপনার মেয়ে রাগ করে, সেই ভয়ে দিন রাত এই খানেই পড়ে আছি। যদি বাগানে যাই, আপনার মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই যাই। আজ আমার বাড়ীতে গুটিকতক ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলুম, তাই একটু রাত হয়েছে। এতে বলে কি না মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা হবে। মা, আপনিই বিচার করুন, বলুন আমার কি দোষ?"

বুড়ী সে কথায় কান না দিয়া বলিল,—"অমন মেয়ে আর হবে না! তুমি একদণ্ড না থাক্‌লে মেয়ে যেন কি এক রকম হয়ে যায়। মেয়ে খায় না, দায় না, কথা কয় না, ঘরের কোনে ব'সে ফোঁস্‌ ফোঁস ক'রে কাঁদে; এক একবার ছাতের উপর উঠে আকাশ পানে চেয়ে থাকে। এতখানি ভালবাসা তোমার উপর; তুমি বাবা, এখন অবধি আর এত রাত কোরো না।"

হেমাঙ্গিনীকে আর পায় কে? মায়ের দিকে চাহিয়া সোহাগে আটখানা হইয়া বলিতে লাগিল,—

"মা মা, আমায় কোথাও রেখে আয়। আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়েচে। এমন লোকের হাতে না দিয়ে, তুই যদি আমার গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিতিস্‌, তা হ'লেই আপদ চুকে যেত। আমার আর কি সুখ? না আছে পাঁচখানা গয়না, না আছে টাকা কড়ি, না আছে একখানা বাড়ী, আমার আর কি সুখ? তাও যা হোক্‌, বাবুটি যদি কাছে থাকে, তা হ'লেও না হয় পাঁচটা

কথা কয়ে এক রকম ভুলে থাকি ; তাও না, তবে আর আমার বেঁচে সুখ কি মা ?"

এই সব কথা বলিতে বলিতে আদরিণীর দুটি চক্ষে কপট কান্নার জল ধারা বহিল। কপটী হেমাঙ্গিনীর মা মনে মনে মহা আনন্দিত হইল ; কেননা সে হেমাকে যেরূপ পরামর্শ দেয়, হেমা ঠিক সেই মতই কাজ করে।

আনন্দ গোপন করিয়া, স্নেহের ভান জানাইয়া, বুড়ী তখন মেয়েকে ভৎ'সনা করিয়া বলিতে লাগিল,—

দেখ্ হেমা, জামায়ের নিন্দে আমার কানে তুলিস্‌নে। জামাই আমার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, এমন জামাই আর হবে না,— আমার রাজা জামাই, বাবার আমার পঁচিশ খানা বাড়ী,—বাবা আমার বেঁচে থাকুক, আমার মাথায় যত চুল, তত পরমায়ু হোক, তোর ভাবনা কি ?"

মূর্খ ফটিক চাঁদ একে তোষামোদ-প্রিয়, তাহার উপর ময়না বুড়ীর খোসামোদী কথায় আহ্লাদে ফুলিয়া উঠিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন,—

"মা, আমি তোমার হেমাকে একখানা বাড়ী দোবো, অনেক দিন থেকে মনে মনে ভেবে রেখেছি। কালই সে কাজটা শেষ করা যাবে ; কালই একখানা ওর নামে লেখা পড়া ক'রে দোবো ; বাড়ী খানার মাসিক ভাড়া একশ টাকা।"

হেমার মার প্রাণে আর আনন্দ ধরিল না, হেমাঙ্গিনীর মানস-সাগরেও আনন্দের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল, শত মুখে ফটিক চাঁদের

প্রশংসা করিতে করিতে বুড়ী তখন হেমাঙ্গিনীর প্রশংসা জুড়িয়া দিয়া বলিল,—

"এমন ভাল মেয়ে আর হবে না, তা হবেই ত, এ ত বাজারে নয়, ভদ্র ঘরের মেয়ে, তা হবে না কেন ? সোনা-জোঁকা মেয়ে ; একদিকে সোনা, একদিকে আমার হেমা।"

জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটা। গুণ-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৎর্সনা আসিল, কপটে ভৎর্সনা করিয়া বুড়ী তখন হেমাকে বলিতে লাগিল,—

"জামাই যেন আজ একটু রাত্তির ক'রেই এসেছে, তা ব'লে কি এত ঝগড়া কত্তে হয় ? ঢের রাত হয়েচে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়্ বেশী রাত জাগ্‌লে বে'ম হবে, জামায়ের অসুখ কর্‌বে।"

দাশুরায়ের পাঁচালির মতন এক সঙ্গে দুই ভাবের ছড়া কাটাইয়া বুড়ী থপ্ থপ্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। ফটিক চাঁদ মনে মনে বলিলেন,—

"হেমার মা কি উদার-প্রকৃতি, এমন মা আর হবে না !"

মা নামিয়া গেল, হেমাঙ্গিনীর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিও আর রহিল না। কার্য্য সিদ্ধি হইল, ঝড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাত সব থামিয়া গেল ; আকাশ পরিষ্কার হইল ; অন্ধকার মেঘে পূর্ণচন্দ্র ঢাকা পড়িয়াছিল ; মেঘ কাটিয়া গেল, পূর্ণচন্দ্র আবার প্রকাশ পাইল ; হেমাঙ্গিনীর মুখচন্দ্রিমায় হাস্য প্রকটিত হইল। ডাগর ডাগর চোখ ঘুরাইয়া, ফটিক চাঁদের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া সে তখন মধুর মধুর প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইল।

ষষ্ঠ উল্লাস।

"রাজায় যারে করে হেলা।
চাষায় তারে মারে ঢেলা॥"

রজনী দ্বিপ্রহর, হেমাঙ্গিনীর গৃহে আজ মহা আনন্দ-কোলাহল। হেমাঙ্গিনীর নৃত্য গীত চলিয়াছে, সেই সঙ্গে বাঁশি, হারমোনিয়ম চলিয়াছে; বাঁয়া তবলার চাঁটিতে পাড়া মাত করিয়া দিতেছে; হাস্য কোলাহলের সঙ্গে হল্লা চীৎকারে ঘরখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

ফটিক চাঁদ সম্মুখে বসিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখ-নিঃসৃত মধুর গীত শ্রবণে আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন। হেমাঙ্গিনীও ফটিক চাঁদের প্রাণ মন কাড়িয়া লইবার জন্য এক বার আড় নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে, আর মধুর হাসি হাসিয়া হস্ত ঘুরাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, পীনোন্নত পয়োধর অধিকতর উন্নত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। দর্শকমণ্ডলী নৃত্যচাতুর্য্য দর্শন করিয়া বাহবার উপর বাহবা দিতেছে। হেমাঙ্গিনীর প্রশংসায় ফটিক চাঁদের হৃদয়-সমুদ্রে তখন কিরূপ আনন্দের তুফান বহিতেছিল,

পাঠক, যদি কখন সেই অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন, নচেৎ লেখনীমুখে বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

হেমাঙ্গিনীর নৃত্য গীতে যে সময়ে আসর খুব জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে কটা-দেবা টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাঁজ-খাই আওয়াজে গান যুড়িয়া দিল। জমাট আসর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ফটিক চাঁদ চটিয়া উঠিলেন, মটুক চাঁদের প্রতি হুকুক দিলেন,—

"মট্‌কো ওটাকে কান ধরে বার করে দেত।"

পূর্ব্ব হইতেই দেবেনের উপর মটুকচাঁদের রাগ ছিল, হুকুম পাইবা মাত্র, মটুক দৌড়িয়া গিয়া দেবেনের কান ধরিল। দেবেন তাহাই চায়; মটুক তাহার কান ধরিল, সে তাহাতে রাগ দেখাইল না বরং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। অভ্যাস মত ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল,—

"বাহবা কুঁজো, বেঁচে থাক্! ছেলে বেলায় অনেক কান খেয়েচি বাবা, কানে কড়া পড়ে গেছে। ধর্ ধর্, কান দুটো ভাল ক'রে টেনে ধর্; দেখিস্, যেন পিছ্‌লে না যায়; আমিও ধুকুড়ি মন্তর আওড়াতে থাকি।"

দেবেনের সরস উত্তরে ফটিক চাঁদ আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। মজলিসের অন্যান্য লোকেরাও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মটুক উৎসাহ পাইয়া

হাসিতে হাসিতে দেবেনের কান দুটো আচ্ছা করিয়া কসিয়া ধরিল। দেবেন হেলিয়া দুলিয়া ধুকুড়ি মন্তর আওড়াইতে লাগিল,—

"আগা ডুম্, বাঘা ডুম্, ঘোড়া ডুম্ সাজে।
ঢোল মৃদঙ্গ ঘাগর বাজে॥
বাজাতে বাজাতে পড়লো ঢুলি।
ঢুলি গেল সেই কমলা টুলি॥"

মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মটুকের কোমর ধরিয়া দেবেন তাহাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া লইল; হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"এসো বাবা! এবারে কি হয় কুঁজো বাছাধন!"

মটুক ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল,—

"দেবা! তোর পায়ে পড়ি, ছেড়ে দে! ছেড়ে দে!"

মটুককে জব্দ করা দেবেনের ইচ্ছা নয়। হাসিতে হাসিতে রসস্থ করিয়া সে বলিল,—

"তা হচ্ছে না বাবা! এই খানে সাত হাত মেপে নাকখত্ দিবি বল্, তবে ছাড়বো; তা না হ'লে এই খানেই দফা রফা!"

দেবেন এই বলিয়া মটুককে মাথার উপর ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। সাতকড়ি ও ভূতনাথ দুই হাত তুলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিল। ধূম দেখে কে! তাহাদিগের রঙ্গ দেখিয়া সকলেই হাসিতেছিল। যে হেমাঙ্গিনী ঐ চারিজন মোসাহেবকে দুটি চক্ষে দেখিতে পারিত না, সেই হেমাঙ্গিনীও অট্ট অট্ট হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। ফটিক চাঁদের ত

কথাই নাই, হাসিতে হাসিতে তাঁহার দম আটকাইবার উপক্রম হইল। এইরূপ অবস্থা সকলের; কিন্তু মটুকের অবস্থা অন্যরূপ। মটুক নিশ্চিত জানিত যে, দেবেন তাহাকে আঘাত করিবে না, শূন্য হইতে আছাড় দিবে না; কিন্তু দেবেন সে রাত্রে অধিক মদ খাইয়াছিল সকলের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া দেবেনেরও স্ফূর্ত্তি চাগিয়া গিয়াছিল, তাই মটুকের কিছু ভয় হইয়াছিল। মটুক ভাবিল,—

"দেবেন যদি তামাসা করিতে করিতে ফেলিয়া দেয়, কিম্বা আমি যদি তাহার হাত পিছলাইয়া পড়িয়া যাই, তবেই একটা অঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

ভাবিতে ভাবিতে মটুকের মুখ শুকাইয়া আসিল, সে তখন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়াও দেবেন তামাসা মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ ঘুরাইতে লাগিল। ফটিক চাঁদ মটুককে সত্য সত্যই ভীত দেখিয়া দেবেনকে বলিলেন,—

"দেবা করিস্ কি? ছেড়ে দে!"

ফটিক চাঁদের বাক্যে দেবেন আরও মজা পাইল; হাসিয়া বলিল,—

"আচ্ছা বাবা, তুমি যখন বল্‌ছ, তখন ছাড়্‌ছি: তবে আমার একটা আরজি আছে।"

ফটিক চাঁদ বুঝিলেন, মাতালের ঝোক চাপিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি মটুককে দেবেনের হাত হইতে নামাইয়া দেবেনকে বলিলেন,—

"বল্, তোর কি আরজি আছে ?"

দেবেন বলিল,—

"আরজি এই যে, কুঁজো আমার সাম্‌নে সাতহাত মেপে নাকখত্ দিক।"

ফটিক বলিলেন,—

"আচ্ছা, তাই দিচ্ছে। তুই কত মদ খেতে পারিস্, খা; তারপর নাকখত্।"

মদের নাম শুনিয়া দেবেনের আনন্দ বাড়িল। সে তখন মদের বোতল কোলে করিয়া বসিল। মটুক, সাতকড়ি ও ভূতনাথ, তিন জনে একসঙ্গে বলিল,—

"বেশ বাবা, আমরা বুঝি কেউ নই? বানে বুঝি ভেসে এসেছি ?"

এই বলিয়া বোতলটা কাড়িয়া লইতে গেল।

খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির পর তাহারা চারিজনে সেই বোতল লইয়া বসিল। দেবেনের হুটোপাটি করা স্বভাব, চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে না, তার উপর পেটে মদ পড়িয়াছে, হুটোপাটি জুড়িয়া দিল,—বালিস তাকিয়া ছুড়া ছুড়ি করিতে লাগিল। যতক্ষণ দেবেন ঘরে ছিল, ততক্ষণ হেমাঙ্গিনীর মনে শান্তি ছিল না; ভয় পাছে তাহাদের উপদ্রবে ঝাড় দেওয়ালগিরি প্রভৃতি ঘরের আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া যায়।

ভয় পাইয়া, ফটিক চাঁদের দিকে চাহিয়া, হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"বাবু! ও গুণ্ডোকে ঘর থেকে বার করে দাও, সব জিনিষ ভেঙে চুরে ফেল্‌বে!"

হেমাঙ্গিনীর অত্যন্ত দুরবস্থার সময়ে, উহারাই ফটিক চাঁদকে জুটাইয়া দিয়াছিল, আজ হেমাঙ্গিনীর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া দেবেনের অত্যন্ত রাগ হইল; কিন্তু কি মনে করিয়া, রাগটা অনেক কষ্টে চাপিয়া রাখিয়া, একটু স্থির করিয়া বলিল,—

"বিবিজান! এটা গেরস্থের বাড়ী নয়; সে কথাটা মনে রেখো। এখানে আমরা ভদ্র লোকের মতন আস্‌বো, আর ভদ্রলোকের মতন চলে যাব, সে রকম আইন নাই। এটা বেশ্যা বাড়ী, এখানে যদি একটু না নাচ্‌বো না কুঁদ্‌বো, না পাঁচ রকম আমোদ কর্‌বো, ত কোথায় কর্‌বো দিদি? আচ্ছা, যদি তোমার জিনিষ পত্তর ভাঙ্‌বার চোরবার ভয় হয়, আমি আজ তবে বিদায় হই, রাতও অনেক হয়েচে, বন্দিগি বিবিসাব! মনে রেখো।"

এই বলিয়া সেলাম দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিদায় হইল। দেবেনের সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে চলিয়া গেল। রহিলেন কেবল ফটিক চাঁদ আর হেমাঙ্গিনী।

মোসাহেবেরা চলিয়া গেল, হেমাঙ্গিনী মুখ ঘুরাইয়া ফটিক চাঁদকে বলিল,—

"বাবু! দেবার আক্কেল দেখ্‌লে? রাগ ক'রে চলে গেল!"

ফটিক চাঁদ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—

"না না, রাগ কর্‌বে কেন? তোর ওপর কি রাগ কর্‌তে পারে?"

সপ্তম উল্লাস।

"যার জন্যে চুরি করি,
সেই বলে চোর।"

"আউর কেত্তা দূর বাবু?"

সুরতি বাগানে একটা গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিল,—

"আউর কেত্তা দূর বাবু?"

গাড়ীর ভিতর হইতে বাজখাই আওয়াজে জড়িতস্বরে উত্তর হইল,—

"কোথা এনে ফেল্লি?"

কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, বাবুটি মাতাল।

গাড়োয়ান বলিল,—

"সুরতি বাগান।"

গাড়ির বাহিরে মুখ বাড়াইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া মাতাল বলিল,—

"ঐ সরু গলির ভেতোর গ্যাসের সামনে লাল বাড়ী।"

মাতালকে লইয়া গাড়োয়ান, অনেকক্ষণ ধরিয়া এ গলি সে

গলি ঘুরিতেছিল, অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"উ গল্লিমে গাড়ী নেহি ফির্‌তা হ্যায়।"

মাতাল চটিয়া গেল, বলিল,—

"শালা, তুই কোথাকার আনাড়ি গাড়োয়ান।"

গাড়োয়ানও রাগিয়া গেল, বলিল,—

"গাল্লি মৎ দেও বাবু, মু সামারকে বাৎ বোলো।"

মাতাল আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল,—

"ড্যাম, ব্লাগার্ড ফুল ; চপ্‌রও শালা ;—আর একটা কথা বল্‌বি ত জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো।"

মাতালের বলিষ্ঠ দেহ, পাছে মাতলামি করিয়া হাঙ্গামা বাধায়, সেই ভয়ে দুর্ব্বল গাড়োয়ান আর কোন কথা বলিল না,—গজর্ গজর্ করিতে লাগিল। মাতাল সে দিকে কান না দিয়া, হাঁকিয়া বলিল,—

"জল্‌দি চালাও।"

গাড়োয়ান অগত্যা সেই সরু গলির মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করাইল। সে গলিতে গাড়ি ঘুরে না তা নয়, ঘুরাইতে একটু কষ্ট হয়। তাতে আবার আরোহী মাতাল, তাই গাড়োয়ান গলির মোড় হইতে ভাড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টায় ছিল ; কিন্তু যখন দেখিল যে, এ মাতাল যে-সে মাতাল নয়, তখন অগত্যা সেই সরু গলির মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করাইল ; গ্যাসের সামনে লাল বাড়ীর সম্মুখে গাড়ি দাঁড় করাইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,—

"বাবু এহি লাল বাড়ী।"

মাতাল মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেই বাড়ীই বটে; ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—

"শালা, এ গলিতে গাড়ি ঢোকে না? আমায় শালা বোকা পেয়েছিস্?"

বলিয়া ঘুসি তুলিল।

বাবুর পায়ে হাতে ধরিয়া গাড়োয়ান মাপ চাহিল। মাতালের মনে দয়া হইল, মাতাল বলিল,—

"য্যাঃ শালা বেঁচে গেলি।"

মাতাল গাড়ি হইতে নামিয়া, দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—

"যোদ্দা? যোদ্দা?"

রাত্রি তখন আড়াই প্রহর, কেহই উত্তর দিল না। মাতাল আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল,—

"যোদ্দা? যোদ্দা? অ যোদ্দা?

এবারেও কোন উত্তর নাই।

"সব্ মরেছে না কি?"

বলিয়া সজোরে দরজায় ধাক্কা মারিয়া মাতাল বিকট চীৎকার করিয়া আবার ডাকিল,—

"অ যোদ্দা?—অ যোদ্দা? অ যোদ্দা?"

ভিতর হইতে তখন উত্তর আসিল,—

"থাম্ থাম্ যাচ্চি যাচ্চি।"

একটু পরেই এক বৃদ্ধ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, তাঁহার হস্তে একটী প্রজ্বলিত বাতি ছিল, সেই আলোতে মাতালের মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখের আবির্ভাব হইল, তিনি বলিলেন,—

"হতভাগা! যোদ্দা কিরে? বাবা ব'ল্‌তে বুঝি লজ্জা করে?"

মাতাল বলিল,—

"বাবা ব'লে ডাক্‌লে, তুমি কি বাবা এত রাত্রে দরজা খুল্‌তে? আর পাড়ার লোকই বা কি মনে কর্‌ত!"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"দূর্ হ হতভাগা, দূর্ হ!"

গতিক মন্দ দেখিয়া গাড়োয়ান ভাড়া চাহিল।

মাতাল বলিল,—

"বাবা! বেয়ারিং পোষ্টে এসেছে, মাশুল দাও মাল রাখ, তা না দাও এই পার্শ্বেল ফেরৎ চল্‌লো।"

গুণধর পুত্রকে দেখিয়াই বৃদ্ধ যদু বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এখন রাগ আরও বাড়িয়া গেল, বলিলেন,—

"হতভাগা! তোকে কে জায়গা দেবে? দূর্-হ হতভাগা, দূর্ হ'য়ে যা।"

সক্রোধে এই কথা বলিয়া তিনি সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গালাগালি দিতে দিতে, টলিতে টলিতে, মাতাল আবার গাড়িতে উঠিল, হুকুম করিল,—

"চালাও,—ফটিক বাবুর বাড়ী ;—বহুবাজার জল্‌দি চালাও।"

গাড়োয়ান মনে মনে গালি পাড়িতে পাড়িতে বহুবাজারের দিকে ঘোড়া ছুটাইল। ফটিকের দরজায় গিয়া পৌছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও তত রাত্রে কেহ উত্তর দিল না। মাতাল আবার গাড়িতে উঠিল।

এ মাতাল আর কেহ নহে, ফটিক চাঁদের গুণ্ডা মোসাহেব দেবেন ঘোষ। হেমাঙ্গিনীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবেন ভাবিয়াছিল, এ রাত্রে কোথায় যাই? ঠিকানার মধ্যে এক ফটিক বাবুর বাড়ী ; না হয় কোন রঙ্গিলার বাড়ী। ফটিক চাঁদের বাড়ীতে সে রাত্রি যাইতে তাহার মন সরিল না ; কেননা হেমা তাহাকে বড় অপমানের কথা কহিয়াছে, তাহাতে ফটিকচাঁদ কোন কথা কহে নাই, এই দোষ। বাস্তবিক এ দোষ কি কম দোষ! ফটিক চাঁদের জন্য দেবেন রাত্রি-দিন কত ফরমাইস খাটে, ফটিক চাঁদকে সুখী করিবার জন্য কত জঘন্য কাজ করে, সেই ফটিক চাঁদ কোন কথা কহিল না, এটা কি সামান্য অপমান? ক্ষোভে ও দুঃখে দেবেন ভাবিয়াছিল, একেই বলে, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।"

নিরুপায় দেবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাহার পেয়ারের এক মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটাইবার মনঃস্থ করিল। তত রাত্রে পাছে পুলিস ধরে, সেই ভয়ে একখানি ঠিকা গাড়ি ভাড়া করিল। মেয়ে মানুষের বাড়ী গেল, তাহার ঘরে লোক ; তবে আর কোথায় যায় ;

নিজ বাড়ী গেল, সেখানেও বাপের তাড়া খাইল। সুতরাং দেবেনকে আবার "পুনর্মূষিকঃ" হইতে হইল,—পুনরায় সেই ফটিক চাঁদের আশ্রয়।

অষ্টম উল্লাস।

"অরসিকের ভালবাসা।
মুচুরমানের মুরগি পোষা॥"

ফটিক চাঁদের আশ্রয়ে থাকিয়া হেমাঙ্গিনী লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি করিয়াছে। হেমাঙ্গিনী এখন কেউ-কেটা নয়; এখন একজন নামজাদা বারাঙ্গনা। বেশ্যা মহলে হেমাঙ্গিনীর নাম ডাক খুব বেশী। হেমাঙ্গিনীর সুখের পরিসীমা নাই। হেমাঙ্গিনীর সুখ-সম্পদ দেখিয়া অনেকের চোখ টাটাইল। অবিবাহিত ফটিক চাঁদের খরচ খরচা বাদে মাসিক দুই হাজার অ.ড়াই হাজার টাকা হেমাঙ্গিনীর হাতে থাকিত। হেমাঙ্গিনী যে এত শীঘ্র লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে!

একটা সামান্য বেশ্যার লক্ষাধিক টাকা হইল, ইহা হেমাঙ্গিনীর পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। বলিতে কি, হেমার সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, যাহা কিছু তাহার জীবনের আশা ছিল, একে একে সমস্তই পূর্ণ হইল। তবে এক বিষয়ে মনে বড় ক্ষোভ। সে ক্ষোভটা এতদিন মিটাইতে সাহস করে নাই, এই বার সেই বাসনা পূর্ণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। এই বার দুই একজন

সাবেক ইয়ার বন্ধুকে মনে পড়িল,—তাহারা প্রাণের ইয়ার। হেমাঙ্গিনী ভাবিল, সে যে পথের পথিক হইয়াছে, সে পথে তাহাকে যে একজনের কাছেই চিরজীবন কাটাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

হেমা ঠিক ভাবিয়াছে। এতদিন হেমার মনে এ উন্নত ভাব কেন আইসে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! ভাবটা মনে মনে ছিল কি না ছিল, তাই বা কে জানে? হেমা বলিতেছে, ছিল না। বিশ্বাস করিবার কারণ আর কিছুই নয়, হেমার ভয় ছিল, পাছে ফটিক বাবু জানিতে পারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন,—তখন খায় কি? এই ভয়। আর এখন ঠিক বিপরীত ভাব,—ফটিক চাঁদ ছাড়িয়া দিলেও সে এখন রাজরাণীর মতন সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিবে, সে পথ সে করিয়া লইয়াছে; এখন আর কাহাকে ভয়?

সাবেক ইয়ারগণের মধ্যে হেমাঙ্গিনী নেপাল বলিয়া একটী যুবককে বড় ভালবাসিত। সেইটিই তার প্রাণের ইয়ার। নেপালও হেমাকে ভুলিতে পারে নাই। নেপাল এখনও মধ্যে মধ্যে হেমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আইসে;—কিন্তু হেমা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে কি না, তাহা হেমাই বলিতে পারে। নেপালের কথা উঠিলে হেমা বলিত, প্রথম যৌবনে নেপাল তাহাকে কুলের বাহির করে। বাস্তবিক হেমার কুল ছিল কি না, কোন্ কুলে তাহার জন্ম, তাহা আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যত

দূর সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে তাহাকে বেশ্যাকন্যা বেশ্যার নাতিনী বলিয়াই জানিয়াছি। হেমা কিন্তু সে কথা বলে না। হেমা বলে সে বামুনের মেয়ে। ও হরিঃ! কালে কালে হ'ল কি! বেশ্যার মেয়ে বলে কি না বামুনের মেয়ে! আরও হেমা যা বলে, তা শুনিলে কাণে হাত দিতে হয়। হেমা বলে, তার বাপ আছে, মা আছে, ভাই আছে, চার ভগিনী আছে, ভগ্নীপতি এক এক জন ডাক্তার, উকীল,—দেশে খুব জায়গা-জমি আছে, তার বাপ উইলে তার নামে দশ হাজার টাকা লেখাপড়া ক'রে দিয়েছে, বাপ মরিলেই সে দশ হাজার টাকার অধিকারিণী হইবে। ভাবনা কি? হেমার খাইবার পরিবার ভাবনা কি? অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল বলিয়াই সে এ পথে আসিয়াছে।

নেপাল, হেমার প্রথম যৌবন-পদ্মের মধুকর। নেপাল মাঝে মাঝে হেমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। হেমাও প্রায় চোখের দেখা দেখিয়া তাহাকে বিদায় করিত, বুড়ীর ভয়ে অধিক মেশামিশি করিতে পারিত না। এতদিন পরে সুখ-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়টা ভাঙ্গিয়া গেল, নেপালের কপাল ফিরিল। হেমা ত অকৃতজ্ঞ নয় যে, ভালবাসার সামগ্রীকে ভুলিয়া থাকিবে? প্রথম অবস্থায় যে তাহাকে সুখী করিয়াছিল, তাহাকে ভুলিয়া থাকিবে?

নেপাল পূর্ব্বে হেমাকে কি যত্নই না করিত, হেমার মনোরঞ্জনের জন্য কি কার্য্যই না করিত? জল তুলিত, বাসন মাজিত, কাপড়

কাচিত, তামাক সাজিত, বাজার করিত, অসুখের সময় বুক দিয়া সেবা করিত, দিন রাত প্রাণপণে খাটিত। পুরস্কার পাইত কি? পার্ব্বণে,—পার্ব্বণে ঝাঁটা লাথি, আর চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডদানের উপকরণ। নেপাল সেই সকল পুরস্কার মাথা পাতিয়া লইত! এমন নেপালের ঋণ পরিশোধ না করা মহাপাপ। তাই তার ঋণ পরিশোধ করিতে হেমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হেমা একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, যাঁহার বিষয় সম্পত্তি পাইয়া, হেমার আজ এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, সেই ফটিক চাঁদকে হেমার আর ভাল লাগিল না।

এখানে হয় ত অনেকে মনে করিতে পারেন, বেশ্যা কি বিশ্বাস-ঘাতক! নিমকহারাম! যে ফটিক চাঁদের দৌলতে হেমা আজ অতুলধনশালিনী; যে ফটিক চাঁদ হেমার সুখের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, সেই ফটিক চাঁদকে হেমার আর ভাল লাগিতেছে না। ইহার অপেক্ষা নিমকহারামী আর কি হইতে পারে? আমরা কিন্তু এ বিষয়ে হেমার কিছুই দোষ দেখিতেছি না। কারণ, হেমা নেপালের নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, বিশেষ নেপাল দেখিতে কেমন সুন্দর, গোঁফ জোড়াটির কেমন বাহার, চক্ষু দুটি যেন খঞ্জন পাখী, বর্ণ যেন কাঁচা সোনা, তাতে আবার সুরসিক, আর ফটিক চাঁদ একে বেরসিক, তাতে আবার কাল, মোটা যেন ভুঁদো চাঁড়াল, আকাশ পাতাল প্রভেদ। তত গুণের নেপালের ঋণ পরিশোধ না করিয়া, তাহাকে সুখী না করিয়া, তাহার

অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া, হেমাঙ্গিনী নিশ্চন্ত থাকে কেমন করিয়া ? এই সামান্য সাদা কথা না বুঝিয়া বাঁকা বুঝিলে, উল্টা বুঝিলে চলিবে কেন ?

কি জ্বালা ! আচ্ছা আপনারা হেমাঙ্গিনী সুন্দরীর মন লইয়া একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি ; দেখিবেন, হেমার এক বিন্দুও অন্যায় নহে,—হেমার মন ফিল্‌টারের জলের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাতে তিল মাত্র ময়লা-মাটী নাই !

নবম উল্লাস।

"স্বভাব যায় না ম'লে।
ইল্লোত যায় না ধুলে ॥"

জ্যৈষ্ঠ মাস ;—রাত্রি দশম ঘটিকা। কলেজ ষ্ট্রীটে দলে দলে লোক যাতায়াত করিতেছে। গাড়ির পর গাড়ি তারপর গাড়ি চলিয়াছে, বিশ্রাম নাই। ট্রাম গাড়ির গুরু-গম্ভীর গুড়-গুড় শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে। কোন ফিরিওয়ালা সুর করিয়া হাঁকিতেছে,—"চাই সকের নকল দানা চিনের বাদাম ঘুংনি দানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না", কেহ হাঁকিতেছে,—"চাই বরোপ" কেহ হাঁকিতেছে,—"ঘি আছে, চিনি আছে, সুজি আছে, মসেলা আছে, জল নাই, কেটু কেটু গ্রাম", কেহ হাঁকিতেছে,—"চাই অবাক জলপান", কেহ হাঁকিতেছে,—"চাই তোপ্‌সে মাছ", কেহ হাঁকিতেছে,—"যুঁই গোড়ে বেল ফুল", কেহ হাঁকিতেছে,— "চাই ফুলের গয়না।" এক মাতাল বন্ধ শুঁড়ির দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মাতলামি জুড়িয়া দিয়াছে, মাতালের মাতলামি দেখিয়া ছেলে বুড়ো সকলেই হাসিতেছে।

রাস্তা এইরূপ সরগরম, এমন সময় একটি ভদ্রলোক ফিটন্ হইতে নামিয়া এক সদর দরজার কড়া নাড়িলেন, খিট্-খিট্-খিট্! বাটীর ভিতর হইতে বামা-কণ্ঠে ভৎ'সনা আসিল,—

"মুখপোড়ারা কড়া নেড়ে কড়া নেড়ে জ্বালাতন ক'রে মার্‌লে! আমার মেয়ে বাঁধা মানুষের ভাত খায়, আমার বাড়ীতে এ হাঙ্গামা কেন? দূর্ হ পোড়ার মুখোরা, দূর হ'য়ে যা!"

ভদ্র লোকটী একটু একটু টলিতে ছিলেন, মুখ হইতে বিলাতী মদের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিয়া বাহির হইতে ছিল। লোকটী বিশিষ্ট ধনী, তাহা তাহার ফিটন্ গাড়ি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার গাত্রে ভাল সাটিনের জামা, সিল্কের চাদর, শান্তিপুরের কুড়ি টাকা জোড়ার কল্‌কাপেড়ে ধুতি, আর পায়ে সিল্কের মোজার উপর ত্রিশ টাকা জোড়ার বার্ণিশ করা ডসনের পাদুকা।

বামাকণ্ঠধ্বনি শুনিবামাত্র, ভদ্রলোকটী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—

"হে—হে—হে—হেমা,—দ—দ—দ—দরজা খোল্।"

যে ভাবে আহ্বান, তাহাতে বোধ হইল, সেই লোকটি সে বাড়ীর বিশেষ পরিচিত। আহ্বান শুনিবামাত্র একটি কামিনী ঝম্ ঝম্ করিয়া নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল,—অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী, হস্তে বাতী।

এক গাল হাসি হাসিয়া আদরে আটখানা হইয়া, বাবুর হাত ধরিয়া যুবতী তাঁহারে উপরে লইয়া চলিল। পাঠক মহাশয় জানিয়া

রাখুন, মাতালটি সেই ফটিক চাঁদ, আর যুবতীটি আমাদের সেই মানময়ী হেমাঙ্গিনী।

ফটিক চাঁদ হেলিতে দুলিতে, টলিতে টলিতে, যুবতীর পিছনে পিছনে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন। উপর তলায় উঠিবামাত্র হেমাঙ্গিনীর হাতের বাতিটি ফুস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাতাসে নিবিল, এমন মনে হয় না; কেননা, তখন বাতাস ছিল না, ভারি গুমোট। মানুষের অঙ্গে অনবরত বৃষ্টিধারার ন্যায় ঘর্ম্মধারা; পবন দেব দারুণ গ্রীষ্ম-তাপে অচল। যাহা হউক হেমাঙ্গিনীর বাতী নিবিল, আর যেন একটা মানুষের ছায়া সাঁ করিয়া হেমার ঘর হইতে হেমার মার ঘরে প্রবেশ করিল।

ফটিক চাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার না হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, হেমার মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। চতুরা হেমাঙ্গিনী চকিতে ভাব গোপন করিয়া, আদরের ডাক ডাকিয়া ফটিক চাঁদের হাত টানিয়া বলিল,—

"দাঁড়ালে যে, এসোনা,—ঘরে চল না! আমি তোমাকে,—"

হেমার কথা শেষ হইতে না হইতে, হেমার মা একটা আলো লইয়া নিজের ঘর হইতে বাহির হইল; ফটিক চাঁদের সম্মুখে আসিয়া, কম্পিত স্বরে বলিল,—

"চল বাবা চল, ঘরে চল, ও সব কিছু নয়,—ঘরে চল।"

ফটিক চাঁদের আতঙ্ক হইয়াছিল, হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া কম্পিতপদে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্রে অগ্রে হেমা পশ্চাতে হেমার মা।

গৃহে ফটিক চাঁদকে বসাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া হেমার মা একটু আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "দেখেছ বুঝি? কিছু দেখেছ বুঝি? ভয় পেয়েছ বুঝি?—ওটা একটা অব্‌ছায়া!—কথাটা কি জান, বাড়ীতে উপরি দেবতা আছে,—বেম্মদত্তি! রোজ রোজ আমি দেখি, কিন্তু বাবা, অনেক দিন আমরা ·আছি, কখন কোন অনিষ্টি করেনি।"

এই বলিয়া আতঙ্কের ভাণ করিয়া বুড়ী তখন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—শ্বাস টানিয়া টানিয়া কথা বলিতে লাগিল,—

"দেব্‌তা,—উপরি দেব্‌তা,—বাবা!—নমস্কার!"

বার বার ঐ কথা,—বার বার নমস্কার। অপরে যদি সে সময় বুড়ীর সেই সকল কথা শুনিত, কাঁপুনির সঙ্গে নমস্কারের ঘটা দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভাবিত এ বাড়ীতে ভূত আছে।

ফটিক চাঁদেরও সেইরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইল। অগ্রে মানুষ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, হেমার মার অভিনয়ে সে সন্দেহটা দূর হইল, একটু ভয়ও হইল, সাহসে ভর করিয়া তিনি বলিলেন,—

"ড্যাম কেয়ার।"

হেমাঙ্গিনী আদর করিয়া বাবুকে বাতাস করিল, নিজেই তামাক সাজিয়া দিল, তাহার পর বোতল গ্লাস বাহির করিল। হেমার মা হাঁপ ছাড়িয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

দশম উল্লাস।

("ভালবাসি কেমন?
ভালবাস যেমন।")

"তোর পায়ে পড়ি, তুই কিছু মনে করিস্ নি।"

একজন যুবক হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গ করিয়া একটি যুবতীকে ঐ কথা বলিল।

যুবতী বলিল,—

"মনে কোর্‌বো না, খুব মনে কোর্‌বো; ঠিক্ জানিস্, তোকে ছাড়া আর কা'কেও আমি মনের মাঝে ঠাঁই দোবো না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সোহাগভরে যুবকের গালে চাঁপা করিল মত অঙ্গুলির টোকা মারিয়া, যুবতী পুনর্ব্বার বলিল,—

"অত ভালবাসা জানাতে হবে না।"

যুবক। তোকে জানাব না ত কা'কে জানাব?

যুবতী। আমি তোর ভালবাসা খুব জেনেছি।

যুবক। আমিও তোর ভালবাসা খুব জেনেছি।

যুবতী। তাইত প্রাণ নেপাল!

যুবক। তাইত প্রাণ হেমা!

যুবতী। দূর্ মুখপোড়া!

যুবক। দূর্ মুখপুড়ী!

যুবতী। দূর্ হতভাগা!

যুবক। দূর্ হতভাগী!

যুবতী। দেখ্ জ্বালাস্‌নে বল্‌ছি!

যুবক। তুইও জ্বালাস্‌নে বল্‌ছি!

যুবতী। তোর সঙ্গে কেউ কথায় পার্‌বে না।

যুবক। লাগ্‌তে আসিস্ কেন?

যুবতী। কি লেগেছি?

যুবক। এই ধোরে ভদ্দর ঘটানো।

যুবতী। আমি ঘটিয়েছি না তুই?

যুবক। আমি?—আমি আবার কি ঘটালুম? আমি একলা মায়ের একলা ছেলে, মায়ের কাছে শান্তিতে ছিলেম, তুইত আমাকে সেখান থেকে টেনে এনে মজালি।

যুবতী। তাইত রে হতভাগা, মুখপোড়া, তবে তুই আমাকে না দেখে থাক্‌তে পারিস্‌নে কেন রে পোড়ার মুখো?

মৌখিক রাগ করিয়া যুবক বলিল,—

"তবে রে, আমি এই চল্লুম।"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। পাঠক মহাশয় অনুভবেই বুঝিয়া থাকিবেন, এই যুবতিটি আমাদের ফটিক চাঁদের

হেমাঙ্গিনী, আর যুবকটী ঐ হেমাঙ্গিনীর সেই প্রাণের ইয়ার নেপাল।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে উঠিয়া নেপালের তুই হাত ধরিয়া টানিয়া প্রেমে ডগমগ হইয়া বলিল,—

"রাগ কর্‌তে আছে কি প্রাণ!"

নেপাল বলিল,—

"তোর উপর কি রাগ কর্‌তে পারি প্রাণ!"

প্রেমালিঙ্গন করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"ওরে আমার প্রাণের প্রাণ, তোকে দেখলে আমি থাকি ভাল, স্বর্গ যেন হাতে পাই, তুই রোজ আসিস্।"

নেপাল। তুই ত বলিস্ রোজ আসিস্, কিন্তু ফলটা কি ভেবেছিস্? ধরা পোড়ে হ্যাচ্‌কাটানে গরীবের প্রাণটা যাক্ আর কি!

হেমা। ধর্‌তে পার্‌লে ত!

নেপাল। পাঁচদিন চোরের একদিন সাধের।

হেমা। নে—নে, ঢের দেরি!

নেপাল। নে—নে ন্যাকৃরা রাখ্! তোর মতন অনেকে ও কথা বলে।

হেমা। আমার প্রাণ থাকৃতে তোর গায়ে আঁচড় লাগ্‌তে দোবো না।

নেপাল। যদি ধরা পড়ি, তখন কি কর্‌বি?

হেমা। যে তোরে ধর্‌তে আস্‌বে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াব।

নেপাল। এত পীরিত কবে হোলো ?

হেমা। চিরকালই আছে।

নেপাল। সাম্‌নে আছি বলে বড়াই কচ্চিস্‌।

হেমা। মাইরি বল্‌ছি—তোর দিব্বি।

নেপাল। তোদের দিব্বি টিব্বি রেখে দে, ঢের দেখেছি।

হেমা। আমার কথায় কি তোর বিশ্বাস হয় না ?

নেপাল। তোকে আমি খুব বিশ্বাস করি ; তবে কি না,—

হেমা। থাম্‌লি যে ?—তবে কি না কি ?

নেপাল। রূপেয়া বড় শক্ত চীজ্‌।

হেমা। রূপেয়ায় আমার দরকার নেই।

নেপাল। কিসে তবে দরকার ?

হেমা। প্রাণের মানুষে।

নেপাল। কে সে ?

হেমা। (আদরে নেপালের চিবুক ধরিয়া) এই, তুই রে আমার প্রাণের মানুষ, তুইরে আমার প্রাণ! (প্রেমসোহাগে সুর করিয়া)

"কি ক্ষণে নয়নে তোরে হেরেছি রে প্রাণধন!
হৃদে রাখি সদা দেখি এই মম আকিঞ্চন!"

যে দিন তোরে চক্ষে দেখেছি, সেই দিন অবধি ভাল বাস্‌তে শিখেছি ; তোর প্রেমে সেই দিন থেকেই জন্মের মতন বিকিয়ে আছি।

নেপাল। ওটা কেবল মুখের কথা, মন ভুলাবার ফাঁদ।

হেমা। সত্যি বল্‌চি নেপা, তোকে আমি বড় ভালবাসি। তুই যদি আমার মনের ভেতর ঢুকে দেখিস্‌, তা হ'লে দেখ্‌বি, তোকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে আমার প্রাণের ভেতর কি ক'রে ওঠে। নেপা! নেপা!! নেপা!!! তুই আমার প্রাণ,—তুই আমার সর্ব্বস্ব! যদি পৃথিবীতে ভাল বাস্‌বার কিছু থাকে, তবে তুই আমার সেই ভালবাসা! সেই যে বদন অধীকারীর যাত্রায় আছে,—

("কি দিব, কি দিব, তোমায় মনে ভাবি আমি,
সবাকারি সবাই আছে, আমার কেবল তুমি।"—)

সত্যি বল্‌চি নেপা তুই আমার তাই। এই চার বচ্ছর তোর কাছ ছাড়া হোয়ে যে, কি দুঃখে, কি কষ্টে দিন কেটেচে, তা বল্‌বার নয়। তুই যেন ভাবিস্‌ নি যে, আমার নিজের সুখের জন্যেই ফটিক চাঁদের কাছে আমি বাঁধা আছি; কেন আছি জানিস্‌? তাইরে নারে—তাইরে না! আমি যা তোর, তোরই তাই আছি। ফটিক চাঁদ কেবল ছায়ার পুতুল, দুটো মিষ্টি কথা ক'য়ে, একটু মিষ্টি হাসি হেসে আমি তার মন ভুলাই, বাঁদর নাচিয়ে নিয়ে বেড়াই; ফিকিরে ফিকিরে টাকা আদায় করি, সেই টাকায় তোতে আমাতে সুখে বাস কর্‌বো, তাই আমার ইচ্ছে। এখন আর আমার টাকার ভাবনা ভাব্‌তে হবে না, অনেক টাকা হাত করে নিয়েচি। নেপা, তুই কিছু মনে করিস্‌নি,—তুই আমায়

অবিশ্বাসী মনে করিস্ নি। এই যে আমার এত টাকা হয়েচে, তুই ঠিক জানিস্, এ আমার নয়,—তোর।”

এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া, হেমাঙ্গিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু ঢাকিল।

হেমাঙ্গিনীর ভালবাসা দেখিয়া আহ্লাদে নেপালের চক্ষে জল আসিল; কাতর হইয়া বলিল,—

“হেমা! আমিও তোকে যে কত ভালবাসি, তা আর কি বোল্‌বো! তোর ঐ চাঁদমুখখানি একদিন না দেখ্‌লে প্রাণের ভেতর যে কি করে, তা আর কি বল্‌বো! এক এক দিন মনে হয়, দুজনে নির্জ্জনে ব’সে, প্রাণের কথা ক’য়ে যাতনার লাঘব করি; তাই এক একবার তোর কাছে ছুটে আসি, কিন্তু ভয় হয়, পাছে তুই রাগ করিস্, পাছে তোর অঙ্গে ধূলো পড়ে, পাছে ফটিক চাঁদ জান্‌তে পারে। এই ভয়ে অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা করিনি। কি ভাবনায় আমার দিন কেটেছে, ভগবান জানেন। ওঃ! কি কষ্টই পেয়েছি! বসে সুখ পাইনি, দাঁড়িয়ে সুখ পাইনি, খেয়ে সুখ পাইনি, শুয়ে সুখ পাইনি, দুনিয়া অন্ধকার দেখেছি!”

আদরে আদরে প্রেমানুরাগে এই সব কথা বলিতে বলিতে নেপাল হেমাঙ্গিনীকে যুগল বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া, হৃদয়ের আবেগে আবার বলিতে লাগিল,—

“হেমা! হেমা!! হেমা!!! প্রাণের হেমা! হৃদয়েশ্বরী! তোকে আমি ভালবাস্‌তে জান্‌লেম না, শিখ্‌লেম না,

পার্লেম না! এতদিনে জান্লেম্ তুই আমায় সত্য সত্যই ভালবাসিস্!”

এই বলিয়া নেপাল অজস্র চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

যে সময়ে নেপাল ও হেমাঙ্গিনীর এইরূপ প্রেমাভিনয়, অনবরত উভয়েরই চক্ষে জল, উভয়েই মনে মনে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিল, ঠিক সেই সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল,—খিট্—খিট্—গিট্।

কড়া নাড়ার শব্দ হেমার মার কানে গেল। চতুরা ময়না আজগুবি ছল করিয়া পাড়ার ছেলেদের গালি পাড়িতে লাগিল; বকিতে বকিতে হেমার ঘরে আসিয়া, হেমাকে সাবধান করিয়া দিল।

হেমা জানিত, সে দিন ফটিক চাঁদের নিমন্ত্রণ ছিল, রাত্রি দুপুরের কমে ফিরিবে না; সুতরাং সে রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া নেপালের সঙ্গে মনের আনন্দে প্রেমালাপ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কড়া নাড়ার শব্দে তাহারা ঠিক বুঝিল, ফটিক চাঁদ। দশটা বাজিতে না বাজিতেই ফটিক চাঁদ আসিয়া উপস্থিত!

হেমাঙ্গিনী মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। নেপালকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, সেই ভাবনায় তাহার প্রাণ আকুল হইল। একবার ভাবিল, মায়ের ঘরে লুকাইয়া রাখে; কিন্তু সাহস হইল না। সাহস না হইবার কারণ, পাছে অপমান বোধ করিয়া নেপাল আর না আইসে। হেমা আবার ভাবিল, কি

উপায় হয়? অকস্মাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল; দৌড়িয়া তার মার ঘরে গেল, দুইজনে পরামর্শ করিল; তারপর নেপালকে অন্ধকারে বারান্দার পাশে সিঁড়ীর উপরে থাকিতে বলিয়া, অন্য দিনের মত ফটিক চাঁদকে আনিতে গেল। ফটিককে লইয়া হেমা যখন উপরে উঠিতেছিল, হাতে বাতী ছিল। আলো দেখিয়া নেপালের বড় ভয় হইল, পাছে ফটিক চাঁদ দেখিয়া ফেলে। তাহার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, দৌড়িয়া বুড়ীর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে হেমাঙ্গিনী ফুৎকারে বাতী নিবাইয়া দিয়া ছিল। তারপর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ব উল্লাসে বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ উল্লাস।

"রাজার বাড়ী চুরি।
হারি কি তারি॥"

ফটিক চাঁদ একটা ছায়া দেখিয়া ছিলেন, ভয় হইয়াছিল, সন্দেহ হয় নাই; হেমার মার কৈফিয়তে সে ভয়টা ঘুচিয়া গিয়াছে। এই রাত্রে হেমার কাছে, হেমার মার কাছে, তাঁহার আদরের মাত্রা অনেক বেশী; আজ আদরের ঘটা দেখে কে! বুঝাইয়া পড়াইয়া ফটিক চাঁদকে ঠাণ্ডা করিয়া, হেমার মা তথা হইতে উঠিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল; ফটিকের কাছে রহিল কেবল হেমা।

বাবুকে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, কি খাইতে দিবে, এই উদ্বেগে হেমা মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। উদ্বেগটা বাহিরে, অন্তরে বিপুল আনন্দ। হেমার মুখে আজ হাসি ধরে না; পাঁচ বার হাসিয়া তবে একটা কথা কয়,—আর আহ্লাদে আটখানা হইয়া ফটিক বাবুর গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

আজ ফটিক বাবুর আনন্দের সীমা নাই। সেরূপ আদর-যত্ন তিনি সেখানে অনেক দিন পান নাই। তিনি আজ আপনাকে মহা ধন্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল

হেমার মত "জলি" মেয়ে-মানুষ তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি আরও ভাবিলেন, হেমার বাহির যেমন সুন্দর, অন্তরও তেমনি সুন্দর; মানবীরূপে হেমাঙ্গিনী একটি দেবী।

ফটিক চাঁদ মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে হেমার মা থপ্ থপ্ করিয়া সেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল, আদর জানাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল,—

"কিছু মনে কোরো না বাবা, সে সব কথা ভুলে যাও। তুমি এসেছ, তা যদি আমি জানতুম্, তা হ'লে দুটি ঠোঁট এক কত্তেম না। সাট্ সাট্ সাট্ সেটের বাছা, মাথার মণি। তোমায় কি আমি কোন কু-কথা বল্‌তে পারি? কথাটা কি জানো; পাড়ার মুখপোড়া ডান্‌পিটে ছোঁড়ারা, রাতদিন কড়া নেড়ে, কড়া নেড়ে, জালিয়ে পুড়িয়ে মারে! চাকরটাও সারা হয়, আমরাও সারা হয়ে গেলুম! চাকরটা কোন কথা বল্লে, ছোঁড়ারা উল্টে তাকেই মারবার জন্যে তাড়া করে! কাজে কাজেই আমাকে গাল্ পাড়্‌তে হয়। ছোঁড়াদের কিন্তু একটা গুণ আছে, গালাগাল খেলেই সরে যায়, আর কোন উৎপাত করে না।"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"সকল পাড়ার বখা ছোঁড়াদেরই ঐ স্বভাব। আমি তাতে কিছু মনে করিনি। গালাগাল না দিলে বেটাদের বুক বেড়ে যায়।"

মেয়েকে আদর করিয়া, থাকমণি বলিতে লাগিল,—

"হিমু, বাবাকে বাতাস কর্। আহা! বাছা ভয় পেয়ে ছিলেন,—ভাল করে ঠাণ্ডা কর্—খাওয়া দাওয়া সব যোগাড় করে দে,—বোতোলটা কোথা রেখেছি ভাল,—হাঁ, হাঁ,—ঐ খাটের মাথার দিকে তাকের উপর কাগজ মোড়া। গেলাস টেলাস সব সেইখানে আছে ; খুব খাতির যত্ন কর্ ; বাবার বাঁপায়ের কড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি যদি হতে পারিস্, তা হ'লে আর তোরে পায় কে ?"

হেমার মা যেরূপ সুর করিয়া, তোষামোদ করিয়া, ঐ কথাগুলি বলিল, তাহাতে তোষামোদ-প্রিয় ফটিক চাঁদের পরিতোষের কথা দূরে থাকুক, একজন অপরিচিত লোক, যিনি বেশ্যার নামে জ্বলিয়া যান, তিনিও ঐ সকল তোষামোদের কথায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

ফটিক চাঁদ একেবারে গলিয়া গেলেন। বুড়ীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তিনি একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইলেন ; মাতৃভক্তি জানাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"মা! মা!! আপনি আমার গর্ব্ভধারিণী মা !!!—তার চেয়েও বরং বেশী! আপনার ঋণ আমি এ জন্মে শুধ্‌তে পার্‌ব না। আপনার মুখ চেয়েই আমি বেঁচে আছি। আমার আর কে আছে ? মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই, আত্মীয় কুটুম্ব যারা আছে, তারা একবার উঁকি মেরেও দেখে না। আপনিই আমার ব্রহ্মময়ী মা! আশীর্ব্বাদ করুন, হেমাকে নিয়ে যেন আমি চিরকাল সুখে থাকতে পারি। আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে

দেবার জন্যে কত লোকে কত সাধাসাধি কত উমেদারি ক'রে বেড়াচ্চে, কত ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আস্‌চে, আমি তাদের এক কথা বলে দিয়েচি, বিয়ে কোরবো না। সে মা,—সে কেবল আপনার ও আপনার মেয়ের যত্নের গুণে, আপনাদের ভালবাসায়!”

হেমার মা বুঝিল, ষোল আনা মাত্রায় বিষ ধরিয়াছে। বুড়ী আবার অমৃতবচনে বলিতে লাগিল,—

“আমার হিমুর মতন মেয়ে আর হবে না। এ পথের মেয়েরা বাবুর চোকে ধূলো দিয়ে, হরেক রকম বাবুর সঙ্গে, কত জায়গায় যায়, কত বাগানে যায়, বাবুদের সঙ্গে বাবু সেজে থিয়েটার দেখ্‌তে যায়; মাসী পিসীর বাড়ীত আছেই। হিমুর আমার সে সব উৎপাত নেই। গঙ্গা নাওয়া ছাড়া, বাছা আমার বাড়ীর চৌকাটের বাহিরে পা বাড়ায় না। দিবানিশি হিমু তোমার পায়ের তলায় পোড়ে আছে। হিমুর মতন অমন শান্ত মেয়ে আর দুটী নেই, তেমন তেমন জায়গায় নেমন্তন্ন হ'লে, আমি বলি “যা,— বাবা রাগ করবে না, যা।” হিমু তা যায় না, হিমু বলে, ‘আমার নেমন্তন্নে কাজ নেই, অন্য লোকে আমার কাজে না আসে না আস্‌বে; বাবুকে না বলে আমি কারুর বাড়ী যাব না।’ ভাব দেখি বাছা, এ পথের মেয়ের এটা কি সামান্যি গুণ!”

হেমার মার মিষ্ট মিষ্ট দীর্ঘ বক্তৃতায় ফটিক চাঁদ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, স্থির বুঝিলেন, হেমার মার মত এমন মা আর হবে না; আর হেমার ত কথাই নাই, হেমা সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা!

দ্বাদশ উল্লাস।

"কাকের বাসায় কোকিল ছেলো।
দিন পেয়ে সে উড়ে গেলো॥"

পূর্ব্ব উল্লাসে বর্ণিত ঘটনার পরাহে হেমাঙ্গিনীর গৃহে ফটিক বাবু সোহাগে হেমাঙ্গিনীর চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"তুই'ও যে রং চড়িয়েছিস্, মাই ডিয়ার!"

হেমাঙ্গিনী। শরীরটে কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ কচ্ছেলো, তাই একটু—

ফটিক। মিলেছে ভাল, মিলেছে ভাল! সখের খাঁচায় মাণিক যোড়!

হেমা। যা বলেছ!

ফটিক। তাইত ভাই, হলি কি? তোর সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি কোথায় গেল?

হেমা। (হাস্য করিয়া) সকল সময়েই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধর্‌লে চলে কি?

ফটিক। এ জ্ঞান কতদিন হোলো?

হেমা। জন্মাবধিই।

ফটিক। মাইরি ?

হেমা। (কপট ক্রোধে) জ্বালিও না বল্‌চি !

ফটিক। না—না, খুব শিষ্ট শান্ত !

হেমা। জামা জোড়া খোল।

ফটিক। আমার নিমন্ত্রণ আছে, যেতে হবে।

হেমা। নেমন্তন্ন মাথায় রাখ ! আর ছেনালীতে কাজ নেই !

ফটিক। না—না, যেতেই হবে। ভদ্র লোকের বাড়ী, বন্ধু লোকের বাড়ী,—ভারী অনুরোধ।

হেমা। পেটে মদ ঢেলে ভদ্র লোকের বাড়ীতে ধাষ্টাম কর্‌তে কি না গেলেই নয় ?

ফটিক। ও—হো—হো ! মদটা আজ না খেলেই ছিল ভাল।

হেমা। সাধে কি রাগ করি !

ফটিক। বাস্তবিক তুই ঠিক কথাই বলিস্।

হেমা। তবু ভাল, আমার কথা মেনে নিলে।

ফটিক। (প্রেয়সীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) কবে আমি না মানি প্রাণ ? তুমি আমার কুঞ্জ বনের মান-গরবিণী রাই কিশোরী ! দেখ্ মাইডিয়ার হেমা ! আমার কথায় রাগ করিস্ নি,—আমি তোকে তামাসা করি।

হেমা। রাগালে আমি রাগবো না কেন ?

ফটিক। আমি রাগলেও তোর রাগ করা ভাল নয়।

হেমা। তুমিত বল ভাল নয়, কিন্তু আমি বলি, খুব ভাল। সেই যে বিন্দাবনে দূতী কৃষ্ণকে বলেছেলো, "প্যারী মান করেচে খুব করেচে, নারী জেতের মান বৈ আর কি ধন আছে।" আমিও সেই কথা বলি।

ফটিক। তবে মর্‌গে যা।

হেমা। তা তোমার কোলে মর্‌তে পার্‌লেও আমার সুখ।

ফটিক। মাইরিরে প্রাণ টকের আলু!

কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ফটিক চাঁদের বাড়ীর এক চাকর আসিয়া একটা চুপড়ি ফটিক চাঁদের হাতে দিল। চুপড়িটা কাপড় দিয়া বাঁধা ছিল।

ফটিক চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিলে?"

চাকর বলিল,—

"মটুক বাবু।"

ফটিক বলিলেন,—

"আচ্ছা, তুই এখন যা, মটুককে একবার আস্‌তে বলিস্‌।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

চুপড়িটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিয়া ফটিক বলিলেন,—

"খোল্‌ত, দেখ্‌ত, কি আছে!"

হেমাঙ্গিনী চুপড়ি খুলিয়া দেখিল, বড় বড় যুঁইয়ের গোড়ে, আর এক সেট্ ফুলের গহনা।

হেমার মুখে আর আনন্দ ধরিল না, হাসিয়া হাসিয়া বলিল,—

"বাবু কি চমৎকার গয়না! যে বানিয়েচে, সে একজন কারিকর বটে! ধন্যি কারিকুরি!"

ফটিক। কদিন ধোরে মটকোকে বলে রেখে ছিলেম, তাই সে এসব যোগাড় করেচে।

হেমা। কত দাম হবে?

ফটিক। আড়াই টাকার কম নয়।

নিজের বাহাদুরি জানাইয়া হেমা বলিল,—

"উঃ! অনেক দাম! এক টাকা হোলেই ঠিক হোতো।"

ফটিক। এক টাকায় কারিকরের মজুরি পোষাবে কেন? এতে কারিকুরি ঢের।

হেমা বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"ওরা যা করে, সব ভাল। এক টাকার ধনে পাঁচ টাকা নিলেও, তোমার কাছে ঠিক হয়। তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মটকো, ভূতো, সাতকোড়ে, দেবা, ওরা না হোলে চলে না। মা কেমন দর কোরে জিনিষ কেনে; মাকে টাকা দিলে এই দরজায় বোসে এর চেয়ে ভাল জিনিষ, কম দরে পেতে।"

হেমার কথা ফটিক চাঁদের ভাল লাগিল না। হেমার মাকে জিনিষ কিনিতে দিয়া তিনি অনেক বার ঠকিয়াছেন, তাই হেমার কথা ভাল লাগিল না। আর এক কথা,—ফটিক বাবু জানিতেন, মটকোকে, ভূতোকে, দেবাকে, কোন জিনিষ কিনিতে দিলে, তাহারা টাকাটা সিকিটা ল'য়, হেমার সেটা বরদাস্ত হয় না। হেমা

যাহা বলিল, ফটিক চাঁদ বুঝিলেন, তাহা অন্যায় ; কিন্তু বুঝিলে কি হয়, তিনি হেমার প্রেমে মজিয়াছেন, সুতরাং হেমার সাত খুন মাপ !

ফটিক বাবু হেমাঙ্গিনীর ক্রুদ্ধ স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, তাই তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া, আদরের ডাক ডাকিয়া বলিলেন, "এসো মাই ডিয়ার, তোমায় সাজাই !"

ফটিক চাঁদ স্বহস্তে হেমাঙ্গিনীর অঙ্গে একে একে সমস্ত গহনা পরাইলেন। মরি—মরি ! হেমার রূপ যেন উথলিয়া উঠিল ! হেমার এত রূপ ফটিক চাঁদ আর কখন লক্ষ্য করেন নাই ; আজ বিশেষ লক্ষ্য হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার হেমাঙ্গিনীর নামের সঙ্গে রূপেরও সাদৃশ্য আছে। একে ফুটফুটে চেহারা, চোক দুটি ডাগর ডাগর, নাকটি টিকোল, কপাল ছোট, দাঁতগুলি মুক্তার মত, উন্নত বপু, ইহার উপর অঙ্গসৌষ্ঠব অতি পরিপাটী, অঙ্গুলিগুলি চাঁপাকলির মত ; বলিতে কি, সুন্দরী হইতে হইলে যে যে লক্ষণ দরকার, হেমাঙ্গিনীর অঙ্গে সে সব লক্ষণ সমস্তই আছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ফুলের গহনাগুলি সেই সুন্দর অঙ্গে শোভিত হইয়া হেমাঙ্গিনীকে কি অপরূপ সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা পাঠক অনুমানেই বুঝিতে পারিতেছেন। সুন্দরী হেমাঙ্গিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্যলহরী নির্ণিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে ফটিক চাঁদ আত্মহারা হইলেন। প্রিয়তমার অপরূপ রূপ-সাগরে আনন্দে আনন্দে ভাসমান হইতে লাগিলেন।

ফটিক চাঁদ পলকহীন দৃষ্টিতে প্রিয়তমার অপূর্ব্ব-রূপ-লহরী নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল—

"এ কাল্ প্যাচাটা তোমার চোকে কি এতই সুন্দর নেগেচে ? আ-মরে যাই আর কি ! কি রূপের ছটা !"

আড়নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনী সেই গৃহের ভিত্তি-গাত্র-সংলগ্ন বৃহৎ দর্পণের নিকটে গেল, দর্পণে আপন রূপের প্রতিবিম্ব দর্শন করিল। হেমাঙ্গিনী প্রতিদিন সেই দর্পণে আপনার মুত্তি দেখে ; কিন্তু আজ ফুলসাজে সজ্জিতা হইয়া, সেই-ই দর্পণে অবলোকন করিল,—যেন এক অভিনব মূর্ত্তি। অলক্ষিতে দুই বিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন-প্রান্তে দেখা দিল, সে তখন মনে মনে বলিল,—

"এই সময় যদি নেপা থাক্‌ত, তা হ'লে কতই সুখের হ'ত !"

হেমাঙ্গিনী চক্ষু মুছিল। চক্ষু মুছিল ;—কিন্তু তাহার হৃদয়ের আঁধার ঘুচিল না, প্রাণের আশা মিটিল না, মনের ক্ষোভ মনেই রহিয়া গেল। দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিতে তাহার আর ভাল লাগিল না,—কষ্টবোধ হইল। হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে হারমোনিয়ম লইয়া বসিল, ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের সুরে গান ধরিল। ফটিক চাঁদ ফুলসাজে সজ্জিতা প্রেম-পুতলী হেমাঙ্গিনীর মধুমাখা গদ-গদ স্বরোচ্ছরিত গীতি-পীযূষ তৃষ্ণোৎকণ্ঠ-শ্রবণে পান করিতে লাগিল।

গীত।

আপন অধিক যারে ভালবাসা যায়।
সে কেন অন্তরে থাকি অন্তরে লুকায়।
মনের আবেগ বশে সারা নিশি জাগি ব'সে,
তাহারি সোহাগ রসে রসিবারে মন চায়।
অরসিকের রস কই, মরমে মরিয়া রই,
তারই তরে এত সই, সই সে কভু না ফিরে চায়।

ফটিক। মাই ডিয়ার, মাই ডিয়ার! আর একটী—

ফটিক চাঁদের তৃপ্তি-সুখ-চরিতার্থে কি না জানি না, হেমাঙ্গিনী আবার গান ধরিল,—

(সই) কেন ভালবাসি তারে।
সে জানে আমি জানিনে, সঁপেছি প্রাণ যারে।
সে আমার সে আমার, জানিনে আমি কি তার,
মন প্রাণ নহে আমার, বলিব আর কারে।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

"পুঁইচে কি প্রাণ, পুঁইচে কি প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মতন হলি পরি বাউ পরাতি পারি।"

ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর সুখের জন্য কিনা করিতেছেন! কিন্তু হেমার মন ফটিক চাঁদের উপর নাই, তা'র মন নেপালের উপর। নেপালের এমন কি গুণ আছে, যাহার জন্য হেমা পাগল। কি গুণ আছে না আছে, হেমাই জানে, আমরা জানি না। তবে একটা সাধারণ কথা এই যে প্রণয়টা চিরকাল অন্ধ। কেহ হয়ত বলিবেন, নেপালের রূপ আছে, সেই রূপেই হেমা পাগল,—সেই রূপেই হেমা মুগ্ধ। বাস্তবিক তা নয়। হেমার অসময়ে নেপাল অনেক উপকার করিয়াছিল, সে হেমাকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইত, জল তুলিত, বাসন মাজিত, কাপড় কাচিত, হেমার অসুখের সময় প্রাণপণ যত্নে সেবা-সুশ্রূষা করিত, আবার সময়ে সময়ে গালাগালির সঙ্গে চড় চাপড় ঝাঁটাও খাইত। ভদ্র লোকের সন্তান হইয়া, একটা সামান্য বেশ্যার সুখের জন্য, তাহার মন পাইবার জন্য, এত জঘন্য কাজ করিত, এত গালি-মন্দ, মার-ধর খাইত কেন, তাহা নেপাই বলিতে পারে। যে খাতায়

নেপালের নাম, দেশের আর আর যাহারা সেই খাতায় নাম লিখাইয়াছে, তাহারা এই প্রণয়ের মহিমা বুঝিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে কাহারও মন পাইতে হইলে, তাহার মনের মত হইতে না পারিলে মন পাওয়া যায় না, নেপাল তাহা জানিত; মূর্খ হইলে কি হয়, সে হেমার স্বভাব ভালরূপ বুঝিয়াছিল; আরও বুঝিয়াছিল, গোলামী না করিলে কাহাকেও গোলাম বানন যায় না। নেপাল গোলামীর সদ্ব্যবহার ভালরূপেই করিয়াছিল। এ হেন নেপালকে হেমা ভালবাসিবে না ত, কি অপরকে ভাল বাসিবে? হেমার হৃদয়ে নেপালের মূর্ত্তি দিবারাত্রি অঙ্কিত ছিল, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বক্ষণ নেপালকে তাহার মনে পড়িত। আজ ফটিক চাঁদ-দত্ত ফুলের গহনায় ভূষিত হইয়া নেপালের অদর্শনে হেমাঙ্গিনীর মনে দুর্জ্জয় আপষোস আসিল। দর্পণে মনোমুগ্ধকারিণী নিজ মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই হেমার প্রাণ নেপালের জন্য কাঁদিয়া উঠিল; পাছে ফটিক চাঁদ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, সেই ভয়ে অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ চাপিয়া রাখিবার অনেক চেষ্টা করিল, তথাপি নয়ন-প্রান্তে দু ফোঁটা জল দেখা দিল; তাই হেমা মনে মনে বলিল,—

"এই সময় যদি নেপা থাকৃত, তা হ'লে কতই সুখের হ'ত।"

হেমা যে ফটিক চাঁদকে আসলে ভালবাসিত না, তাহা নহে, ভাল বাসিত,—সে ভালবাসা কেবল টাকার খাতিরে। ফটিক

চাঁদের টাকা আছে, হেমার অসুখের সময় তিনি টাকা খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইতেন, এক জনের স্থলে পাঁচ জন ডাক্তার দেখাইতেন, বড় বড় জুড়ীওয়ালা সাহেব ডাক্তার আনাইতেন, সেবা সুশ্রূষার জন্য পাঁচজন দাসী নিযুক্ত করিতেন, নিজেও দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার আসিয়া তদারক করিয়া যাইতেন। এত সৃষ্টি করিতেন, তথাপি তিনি নিজের মান ইজ্জত বাঁচাইয়া চলিতেন, মান ইজ্জতের দিকে নেপালের আদৌ দৃষ্টি ছিল না; বাহ্য ব্যবহারে নেপালে ও ফটিক চাঁদে এই মাত্র প্রভেদ।

ফুলের গহনা পরিয়া হেমাঙ্গিনীর মন নেপালের জন্য এতদূর খারাপ হইয়া গেল যে, সে আর সে রাত্রে ফটিক চাঁদের সহিত মন খুলিয়া বাক্যালাপ করিল না; রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া শয়ন করিল। প্রেমের পাগল ফটিক চাঁদ তাহার সে ছলনা বুঝিতে পারিলেন না; হেমার ঘুমের ব্যাঘাত করিলে পাছে অসুখ হয়, সেই ভয়ে কোন কথাও বলিলেন না, মুদিত-নেত্রা হেমার সেই নয়ন-মোহন সুন্দর মুখ পানে চাহিয়া, অপার সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

ফটিক চাঁদ ভাবিতে লাগিলেন যে, হেমা কি অপরূপ সুন্দরী! হেমা কি তাঁহাকে ভালবাসে? তিনি যতদূর ভাবিয়া দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, হেমা তাঁহাকে ভালবাসে; হেমার ভালবাসা অতল জলধির ন্যায় গভীর, সে জলধির কুল-কিনারা নাই। হেমা তাঁহাকে এত ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার

প্রতিদান তিনি কি করিতেছেন? ফটিক চাঁদ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, হেমার ভালবাসার প্রতিদান তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। সে ভালবাসার প্রতিদান করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

চিন্তা করিতে করিতে ফটিক চাঁদ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, অতি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, হেমার পাদ-যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

"হেমা? তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!! অতি সুন্দর!!! তোমার সুখের জন্য আমি যদি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাই, যদি আমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলেও, আমি এক দিনের জন্য অসুখী মনে করিব না। তুমি যেরূপ আমায় ভালবাস, যেরূপ আদর যত্ন কর, সেরূপ ভালবাসার প্রতিদান তোমায় কি দিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তুমি অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!! অতি সুন্দর!!! অন্যে যাহা বলে বলুক, তুমিই আমার অর্দ্ধাঙ্গিণী স্ত্রী। আত্মীয় স্বজন কুটুম্বেরা বিবাহ করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছে, কিন্তু তোমার ভালবাসা স্মরণ করিলে, বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি তোমায় নিকৃষ্টা মনে করি না, আমি জানি, তুমিই আমার বিবাহিতা স্ত্রী; আর তোমার গর্ভে যদি সন্তান জন্মে, সে সন্তান আমার যাবদীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী।"

ভাবিতে ভাবিতে বিভাবরী শেষ হইয়া আসিল, কাকেরা কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ফটিক চাঁদের চক্ষে জল আসিল; বসনে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

সত্য সত্যই হেমা কি ঘুমাইতে ছিল? না,—হেমা ঘুমায় নাই, নয়ন মুদিয়া নেপালের চিন্তায় নিমগ্ন ছিল।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

"যার টাঁর-বাউটি হাতে, তার রুয়ের মুড়ো পাতে,
সে বোস্‌বে ছাপর খাটে।"

বাঘমারিতে ফটিক চাঁদের একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল। উদ্যানটির চতুর্দ্দিক উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উদ্যান মধ্যে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, উভয় সরোবরে চারিটি করিয়া আটটি শান বাঁধান ঘাট। চারি ধারে নানা জাতি বৃক্ষ ও পুষ্প কানন। বাগানের পশ্চিম সীমায় একটা প্রকাণ্ড ঝিল; সেই ঝিলের উত্তর দিকে ও পূর্ব্বদিকে দুইটি শান বাঁধান ঘাট। ঝিলে অসংখ্য মাছ খেলা করে; ছিপ ফেলিবার হুকুম ছিল না, সেই জন্য মাছেরা নির্ভয়ে ঘাটে আসিয়া খেলা করিত; লোকেরা মুড়ি ফেলিয়া দিত, নির্ভয়ে সে সকল মুড়ি খাইয়া খাইয়া যাইত। সরোবরেও যথেষ্ট মৎস্য; বাবু লোকেরা দুই সরোবরেই ছিপ ফেলিতেন, সেই ভয়ে মাছেরা ঘাটের নিকটে আসিত না, অগাধ জলে থাকিত। পুষ্করিণীর জল কাক চক্ষুর মত নির্ম্মল, পল্লির লোকেরা পানার্থে সেই পুষ্করিণীর জল তুলিয়া লইয়া যাইত। উদ্যানে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি যতপ্রকার

ফলের গাছ এবং গোলাপ, বেল, যূঁই, চাঁপা প্রভৃতি ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ। প্রধান ফটকের আশী হাত অন্তরে আর একটা বৃহৎ পুষ্করিণী; সেই পুষ্করিণীর তীরে একখানি মনোরম অট্টালিকা। অট্টালিকার শোভা অতি রমণীয়, রগ্‌ রগ্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। একটী বিস্তীর্ণ হলের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া গদি পাতা; তাহার উপর শাদা ধপ্‌ধপে জাজিম; চারি ধারে ছোট বড় অনেক গুলি তাকিয়া। ঘরের মেঝের অবশিষ্ট অংশে বিচিত্র গালিচা পাতা, চতুর্দ্দিকে টেবিল, চেয়ার, আলমায়রা, টেবিল-হারমোনিয়ম ইত্যাদি সাজানো। বৃহৎ একটা গোলাকার টেবিলের উপর বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ, তানপুরা, সেতার, বেহালা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য যন্ত্র সজ্জিত। গৃহের মধ্যস্থলের কড়িকাষ্ঠে পঞ্চাশ ডাল যুক্ত এক বৃহৎ ঝাড়। অন্যান্য ছোট বড় ঘরেও নানাপ্রকার ঝাড় লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, ছবি, দস্তুর মত সজ্জীভূত।

এই বাঘমারির বাগানে আজ হৈ—হৈ—রৈ—রৈ পড়িয়া গিয়াছে। বেলা পাঁচটা হইতে গাড়ি গাড়ি লোক; প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি একটি সুন্দরী বারবিলাসিনীর আমদানী। ফটিক চাঁদ তাঁহাদিগকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই দুই দল খেমটাওয়ালী, আর দুই দল বাইজী গাড়ি হইতে নামিল, তাহারা অন্য লোক অপেক্ষা অধিক সমাদর পাইল।

রাত্রি প্রায় নয়টা। অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহেই সমুজ্জ্বল আলোকমালা। চাপকানপরা চারিজন হিন্দুস্থানী বেহারা মজলিসে

অনবরত তামাক যোগাইতেছে; গোলাপ-জল ছড়াছড়ি হইতেছে, সোনা-দোনা পান বিতরিত হইতেছে। "প্রাইভেট রুমে" বোতল গ্লাস সানকের ঠনাঠন্ শব্দ, সোডা লেমনেডের বোতলের ছিপি খোলার টপাটপ্ শব্দ।

মজলিস্ একেবারে সরগরম। আজ ফটিক চাঁদের বাগান-পার্টি। ফটিক চাঁদ অনেক বার বাগান-পার্টি দিয়া ছিলেন, কিন্তু আজিকার মত এত ধূমধাম এত লোক সমাগম আর কখন হয় নাই। আজিকার নিমন্ত্রিতের মধ্যে এমন সব বাবু ছিলেন, যাঁহারা এক এক বাগান পার্টিতে হাজার দু-হাজার টাকা এক রাত্রে উড়াইয়াছেন। ফটিক চাঁদ আজ তাঁহাদিগের উপর টেক্কা মারিবেন এই ইচ্ছা।

দেখিতে দেখিতে বড় বড় দাড়ীওয়ালা ঋষিদের মাথায় রকমারি পোঁচ ঘরের বড় বড় বাক্স আসিয়া উপস্থিত হইল।

পার্টি ভোজন ও পার্টি পারিতোষের ভার মটুক, ভূতনাথ, সাতকড়ি ও দেবেনের উপর অর্পিত ছিল। তাহাদের হাতে আজ বড় বড় টাকার তোড়া, পকেটে ছোট বড় ব্যাঙ্ক নোটের তাড়া, এক টাকার স্থলে দশ টাকা, দশ টাকার স্থলে একশ টাকা, একশ টাকার স্থলে হাজার টাকা; খরচ,—টাকার শ্রাদ্ধ! আজ মোসাহেবদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে!

চক্ষের যবনিকা অপসারিত হইলে, আর "প্রাইভেট রুমের" আবশ্যকতা রহিল না, হল ঘরের গদি ও গালিচা বিবিধ উপকরণে

সুশোভিত হইল। সর্ব্বারম্ভে একাকার! হেমচন্দ্রের সঙ্গীতানুসারে হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক! আজিকার বাগান পার্টিতে ফটিক চাঁদের বারো হাজার টাকা বরাদ্দ। পাঠকেরা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না, ফটিক চাঁদ আজ কল্পতরু। ফটিক চাঁদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে! হঠাৎ দিদিমার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে ঐ দ্বাদশ সহস্র রজত মুদ্রার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ!

ফটিকের রক্ত গরম! টাকার গরমে শরীর গরম, মেজাজ গরম, বাবু গিরির ফোয়ারা গরম, সব রকমেই গরমাগরম! হিপ্, হিপ্-হুর্‌রে! মজলিসের সমস্ত বাবু বিবির বদনে প্রতিধ্বনি হইল, হিপ্—হিপ্ হুর্‌রে!

আমোদ যখন পূর্ণ মাত্রায় ছাপাইয়া উঠিল, সেই সময় ভেড়ুয়া-সহচরী জোড়া জোড়া খেম্‌টাওয়ালীর সুঠাম কুঠাম রকমারি নৃত্যোৎসব! খেমটা নাচের বিরামান্তে তয়ফা নাচ। মনোমোহিনী বাইজীরা মজলিসের জাজিমের উপর চরণ ঘর্ষণ করিতে করিতে ঠমকে ঠমকে অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে হিন্দি গীত ধরিলেন,—

"হাম্‌সে ছল্ বল্ কোরি সেঁইয়া,
সতিনী ঘর্‌মে যাওয়ে!"

মজলিসে ঘন ঘন করতালির সহিত শত শত মুখে গগনভেদী শোভান্তরীর ধ্বনি উঠিতে লাগিল, হিপ্—হিপ্—হুর্‌রে!

নানালঙ্কারভূষিতা হেমাঙ্গিনী ফটিক চাঁদের বাম পার্শ্ব শোভিত করিয়াছিল। এক একজন বাবু এক এক বাগান পার্টিতে হাজার দেড় হাজার টাকা খরচ করেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম কুমুদেন্দু বাবু। তিনি একটি সুন্দরী সঙ্গিনী লইয়া আসিয়া ছিলেন। সেই যুগল মূর্ত্তির আসন ফটিক চাঁদের দক্ষিণাংশে। ফটিক চাঁদ সমাগত ভদ্র লোকদিগকে গোলাপ জল, আতর, পান, ফুলের তোড়া দিয়া আপ্যায়িত করিতে ছিলেন, মধ্যে মধ্যে কুমুদ বাবুর সহিত কানে কানে কথা কহিতে ছিলেন, দুই জনেই ঘাড় নাড়ানাড়ি করিয়া হাসিতে ছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর আজ বড় গম্ভীর ভাব, অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রফুল্লতা আনিতে পারিতেছে না, সাম্পেনের গেলাসরাও তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিতেছে না। হেমাঙ্গিনীর নিরানন্দের কারণ আর কিছুই নহে, নেপালের বিরহ। আজ যদি তাহার পার্শ্বে ফটিক চাঁদ না থাকিয়া নেপাল থাকিত, তাহা হইলে হেমাঙ্গিনীর হাস্যধ্বনি গগন ভেদিয়া উঠিত। নেপালের প্রেমে মজিয়াই হেমা কাল করিয়াছে। মজলিসে সকলের মুখ প্রফুল্ল, কেবল হেমার মুখে হাসি নাই। হেমা তখন ভাবিতেছিল,—

"জ্বালিয়ে মার্‌লে। অরসিকের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল। না জানে কথা কইতে, না জানে আলাপ ক'ত্তে, না জানে ইয়ারকি দিতে। ওটা মনে করে, কি রসিকতাই ক'চ্চি; রসিকতা শুনে

ওর মেয়ে মানুষ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্চে! আ মরে যাই আর কি! কি আমার 'অসিক' পুরুষ গো! রসিকতা শিখ্‌তে চাস্, নেপার কাছে দশ বচ্ছর উমেদারি ক'র্‌গে। কথায় বলে 'অরসিককে ভালবেসে, সুখ নাই দেশ-বিদেশে।' আমারও তাই হ'য়েচে,— মরণ হ'লে বাঁচি। রূপও যেমন গুণও তেম্‌নি। দূর্ ছাই! এ কি ভাল্ লাগে? নেপা থাক্‌ত ত দেখিয়ে দিতুম্ বাগান পার্টি কা'কে বলে? রাশি রাশি টাকাই খরচ হ'চ্চে, রগড়ের "র"ও হ'চ্চে না। ফট্‌কে বেশী পেড়াপীড়ি করে, অসুখ ক'চ্চে ব'লে শু'য়ে প'ড়ব। তারপর যে যা ভাবে ভাবুক্,—যে যা বলে বলুক্, ফট্‌কেকে হাত ক'ত্তে কতক্ষণ?"

কুমুদ-সঙ্গিনী-কাদম্বিনী বিদ্রুপচ্ছলে বলিল,—

"ফটিক বাবু, আপনার গিন্নীর মুখে হাসি নেই, একটীও কথা নেই,—ব্যাপার খানা কি? বাবুর মুখে শুনেছি, আপনার গিন্নী বড় রসিকা। আজ গিন্নীর মন্‌টা ভাল নয় বুঝি? হেঁলা? তোর্ বাবুর খরচ হ'চ্চে ব'লে গায়ের জ্বালা হ'য়েছে বুঝি? বল্ আমরা চ'লে যাই।"

ফটিক। আমার গিন্নীর মুখ ত শোনেন্ নি, যখন ছুট্‌বে তখন আর থই পাবেন না।

কাদম্বিনী। তা এক আঁচড়েই বোঝা গে'ছে।

এত টিট্‌কারী শুনিয়াও হেমার মুখে কথা নাই। হেমা মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া ফটিক চাঁদও এক একবার বিষণ্ণ। ফটিক চাঁদ আজ এত টাকা খরচ করিতে বসিয়াছেন, কেবল যে তাঁহার বাবুগিরি দেখাইবার জন্য, তাহা নহে; তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। হেমাঙ্গিনী হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিবে, দুটা পাঁচটা ব্যঙ্গ করিবে, সকলে এক বাক্যে হেমাকে বড় মজলিসি "জলি" মেয়ে-মানুষ বলিয়া তারিফ করিবেন, ফটিক চাঁদ হেমার প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিবেন, আর তিনি যে-সে মেয়ে মানুষের পাদপদ্মে টাকা ঢালিতেছেন না, রূপ-গুণ-সম্পন্না সুন্দরীর প্রেমেই মজিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে তাঁহার বুক পাঁচ হাত হইয়া ফুলিয়া উঠিবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইল, সেই দুঃখে ফটিক চাঁদ বিষণ্ণ।

হেমার উপর ফটিক চাঁদ কখন রাগ করেন নাই। আজ হেমার ব্যবহারে ফটিক চাঁদের রাগ হইল। কেবল হেমার উপর রাগ নহে, বেশ্যা জাতের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে,—

"তাহাদের যত দাও, যত খোসামোদ কর, যত মন যোগাইয়া চল, মন পাওয়া যায় না। মটুক, ভূতনাথ, সাতকড়ি ও দেবেন, চারি জনেই ভদ্র সন্তান, তাহারা বাজার করিতে গিয়া দুই চারি টাকা লইলে হেমার প্রাণ ফাটিয়া যায়; কিন্তু সে যে নিত্য কত টাকা লইতেছে তাহার হিসাব থাকে না, তা ছাড়া পকেটে ত কিছুই রাখিবার যো নাই, ঘড়ি ঘড়ি পিক্

পকেট! এ ত নিত্য আছেই, তা ছাড়া, মা আজ কাশী যা'বে, কাল বৃন্দাবন যা'বে, পরশু নৈমিষারণ্যে যাবে, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, এই সব অছিলায় হেমাঙ্গিনী কত দিন কত টাকা লয়, তাহার সংখ্যা হয় না, সে সব টাকা যেন টাকাই নয়।"

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ফটিক চাঁদের ঘৃণা আরও বাড়িল। তিনি আরও ভাবিলেন,—

"কবে মট্‌কোকে দুই টাকা দিয়াছিলাম, কবে ভূতনাথ আমার টাকায় মদ খাইয়াছে, কবে সাতকড়ি আমার টাকায় ইয়ারের মজলিসে দশ টাকা খরচ করিয়াছে, দেবেন কবে মারামারি করিয়া এক জনের মাথা ফাটাইয়া পুলিসে দশ টাকা জরিমানা দিয়া আসিয়াছে, সে জরিমানার টাকা আমাকে দিতে হইয়াছে, এই সকল খুটিনাটি লইয়া প্রেমময়ী হেমাঙ্গিনী ঝগড়া করিতে বেশ মজবুত। বন্ধু লোকেরা আমাকে যে যে কথা বলিয়াছে, সে সকলগুলিই এখন ঠিক ঠিক ফলিতেছে, বেশ্যা নিমকহারাম জাতই বটে। দেবেন এক দিন আরও একটা কথা বলিয়াছিল, হেমার মার উপর কটাক্ষ করিয়াছিল, সে কথাটা তখন আমি ততদূর বিশ্বাস করি নাই; ভাবিয়া ছিলাম, হেমার মা খুব ভাল, হেমার মা থাকিতে সে সব কিছু হবে না। তখন ঐরূপ ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেবেনের সেই কথায় অনেকটা বিশ্বাস হইতেছে।"

ফটিক চাঁদ এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলেন,—তিনিই তাহা জানেন। শুদ্ধ ফটিক চাঁদ কেন, যাঁহারা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই হেমার ভাব গতিক দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক সুন্দরীর সহিত হেমার বিশেষ ভাব ছিল,— সে হেমাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাসচ্ছলে দুই একটি কথা বলিল, অন্যান্য বিলাসিনীরা বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহাতেও হেমাঙ্গিনীর চৈতন্য হইল না। নেপালের চিন্তায় হেমাঙ্গিনী এত দূর অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, সে নিজের যে কত অনিষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিতেছে না। হেমার দৃঢ় বিশ্বাস অপরে যে যা মনে করে করুক, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ফটিক চাঁদের বিশ্বাস তাহার উপর থাকিলেই হইল। ফটিক চাঁদকে সে যেরূপ বশীভূত করিয়াছে, তাহাতে শত দোষ করিলেও ফটিক চাঁদের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু হেমা জানে না যে, দশ চক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিল,—হেমা ত একটা নগণ্য বেশ্যা। হেমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে বলিয়াই আজ হেমার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, ফটিক চাঁদের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, নচেৎ যেরূপ সু-নজরে পড়িয়াছিল, তাহাতে ফটিক চাঁদের যাবদীয় সম্পত্তি অতি শীঘ্রই উহার পাদ-পদ্মেই বিসর্জ্জিত হইত ইহা স্থির।

পাঠক! মনে করিবেন না যে, ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর চিন্তায় নিজের তখনকার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। মনে

যাহাই থাকুক, বাহিরে কিন্তু সুমিষ্ট প্রিয় সম্ভাষণে তিনি সকলকেই আপ্যায়িত করিতে ছিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। বাইজিগুলির মধুর মধুর গীত শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এ দিকে মাতালের হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ মাতাল মদ খাইয়া পেট ভরাইতেছেন, কেহ বমি করিতেছেন, কেহ বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছেন, কেহ বা মদের ঝোঁকে তাঁর বিধুমুখীর পায়ে কামড়াইয়া দিয়াছেন, বিধুমুখী খুব গালাগালি পাড়িয়া দংশকের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতেছে, মহামারি ব্যাপার!

শ্যাম্পেনের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া মটুক, সাতকড়ি, ভূতনাথ এবং দেবেনের নোলা সগ্ বগ্ করিতেছে। বাকী কয়টা লোককে খাওয়াইয়া দিতে পারিলেই হয়, তাহা হইলে তাহাদের হাড়ে বাতাস লাগে। কুমুদেন্দু ও তাঁহার সঙ্গিনীর আহারাদি হইয়া গিয়াছে, আর ভাবনা কি? দেবেন ব্যতীত সকলের বিশ্বাস বড় মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই পরিশ্রম সার্থক হইল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত লোকদিগের আহারাদি হউক না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। দেবেন কিন্তু সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া আহার করাইয়া দিল। দেবেনের জন্যই ফটিক চাঁদের মান ইজ্জত বাঁচিয়া গেল। যাঁহারা বেহুঁস মাতাল হইয়া পড়িয়া ছিলেন, উঠিবার শক্তি রহিত, তাঁহাদেরই আহার হইল না।

দেবেন যখন দেখিল, নিমন্ত্রিতের মধ্যে সজ্ঞান লোকদিগের আহার সমাপ্ত হইল, সে তখন চাকর বাকর যে যেখানে ছিল, সকলকে বেশ পরিতোষরূপে লুচি মণ্ডা খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর নিজে "প্রাইভেট রুমে" প্রবেশ করিল। প্রথমেই মটুকের সঙ্গে গ্লাস কাড়াকাড়ি। মটুক দেবেনের শক্তিতে পারিয়া উঠিল না, দেবেন মটুকের হাত হইতে গ্লাস কাড়িয়া লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষ করিল।

দুই চারি গ্লাস টানিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমাঙ্গিনীর প্রতি দেবেনের দৃষ্টি পড়িল; আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, "এ দর্প আর বেশী দিন নয়!" কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া দেবেন চুপি চুপি ভাল মানুষের মতন এক পাশে গিয়া বসিল। ফটিক চাঁদ আজ দেবেনের শান্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, উপহাস করিয়া বলিলেন,—

"দেবেন বাবু চুপ করে বস্‌লেন যে? মটুক বাবু কোথায়?"

মোসাহেবগুলিকে মট্‌কো, সাতকড়ে, ভূতো ও দেবা বলিয়া সম্বোধন করা ফটিক চাঁদের অভ্যাস; দেবেনকে ও মটুককে আজ বাবু উপাধিতে গৌরব দেওয়াতে মজলিসে একটা হাসির গর্‌রা উঠিল।

দেবেনকে আর পায় কে? দেবেনের ভয়ে মটুক হল ঘরের এক কোনে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দেবেন সেই দিকে ছুটিয়া গিয়া যেন তাহার কান কামড়াইয়া দিল। কামড়াইল কি না

কামড়াইল কে জানে, মটুক কিন্তু "বাবা গো, বাবু গো কান কামড়ে রক্তপাত করে দিলে গো?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেবেন তখনও মটুকের গলা জড়াইয়া আস্ফালন করিতেছিল। যাঁহারা কাছে ছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া দেবেনকে ছাড়াইয়া দিলেন, এবং যখন দেখিলেন, মটুকের কানে একটুও কামড়াইবার দাগ নাই, তখন একটা বিষম হাসির রোল উঠিল।

ফটিক চাঁদ দেবেনের তামাসার মতলব জানিতেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই হাসিতে ছিলেন। এখন সকলের হাসি দেখিয়া আরও উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন, হেমাঙ্গিনীও একটু হাসিয়াছিল; কিন্তু যে হাসিতে ফটিক চাঁদের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এ হাসি সেরূপ হাসি নয়,—এ হাসি শ্লেষ-কৌতুকমাখা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাইজীদের মিহি সুরের গান শুনিয়া সকলে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন; মিহি সুরের গান আর কাহারও বড় ভাল লাগিতে ছিল না। এমন সময়ে দেবেনের কান কামড়ানির হাসির গোলে তয়ফা নাচ থামিয়া গেল। বাইজীরাও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবেনও একজন গায়ক, দেবেনের গান ফটিক চাঁদের বড় ভাল লাগে। দেবেনকে তিনি একটি গীত গাহিতে বলিলেন। দেবেনও তাই চায়; বিশেষ, এই আসরে গাহিবে বলিয়া সে একটি নূতন গীত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিল; ফটিক চাঁদের আদেশ

পাইবামাত্র এক জনকে হারমোনিয়মে সুর দিতে বলিয়া, দেবেন্দ্র নাথ সেই গানটি ধরিল ;—

গীত।

"কোন্ কালে এক জোটে বুড়ী গিয়েছিল বৃন্দাবন।
লণ্ড্ সাহেবের গির্জ্জে দেখে বলে এই কি গিরি গোবর্দ্ধন ॥"

এই দুই কলি গীত শুনিবামাত্র গৃহের যাবদীয় লোক মহোল্লাসে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, চারিদিক হইতে করতালি দিয়া বাহবা দিতে লাগিলেন, দেবেনের গলা খাদের উপর বড় মিঠা, আর অনেকক্ষণ সরু গলার পর মোটা গলার সুর যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবেনের গান বন্ধ যায় নাই, দেবেন গাহিতে লাগিল ; মটুক, সাতকড়ি ও ভূতনাথ সুরে সুর মিলাইয়া সেই গান ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

"কোন কালে এক জোটে বুড়ী গিয়ে ছিল বৃন্দাবন।
গরুর গাড়ির চাকা দেখে বলে এই কি কৃষ্ণের সুদর্শন ॥
গড়ের মাঠে গরু দেখে বলে এই কি কৃষ্ণের গোচারণ।
বাবাজিদের দেখে বলে এই কি ব্রজের রাখালগণ।
তেঁতুল চারা দেখে বলে এই কি কৃষ্ণচূড়ার নিদর্শন।
হাড়গিলে দেখে বলে এই কি কৃষ্ণের গরুড় বাহন ॥"

দেবেনের গান শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক ঠিকানা নাই। কাহারও হাসিতে হাসিতে কাশি আসিল, কাশিতে কাশিতে, দম আটকাইবার উপক্রম হইল,

কাহারও পেটে খিল ধরিয়া গেল, কেহ বা বমি করিয়া ফেলিলেন, এইরূপ সকলের অবস্থা ;—স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমান অবস্থা। সঙ্গিনীরা হাসিতেছিল ; বিশেষ, দেবেন যখন অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া গানের শেষ কলি গাহিতে ছিল, মটুক, সাতকড়ি ও ভূতনাথ যখন সুরে সুর মিলাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, তখন সুন্দরীর দল, হাসিতে হাসিতে "আর পারি না" বলিয়া যে যার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বাগানের যে যেখানে ছিল, সকলে ছুটিয়া গান শুনিতে আসিল। দেবেনের বাসনা পূর্ণ হইল, তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না।

অতঃপর নিমন্ত্রিত লোকেরা বিদায় হইলেন, মাতাল গুলিকে গাড়ি বোঝাই করিয়া দেওয়া হইল। রহিলেন কেবল ফটিক চাঁদ, কুমুদেন্দু, হেমাঙ্গিনী, কুমুদসঙ্গিনী-কাদম্বিনী, মোসাহেবেরা ও চাকরেরা।

দেবেনের গীত সমাপ্ত হইল। ফটিক চাঁদের ইচ্ছা ছিল, দেবেনকে আর একটী গীত গাহিতে বলিবেন ; কিন্তু দেবেন গীত সমাপ্ত করিয়া, "প্রাইভেট রুমে" গেল। কুমুদেন্দু বাবু হেমাঙ্গিনীর একটী গীত শ্রবণ-মানসে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ফটিক বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ফটিক বাবু, এইবার আপনার সুন্দরীর একটি গান হউক।"

ফটিক বাবু হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন, হেমাঙ্গিনী মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—

"আমার অসুখ কোর্‌চে।"

সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই হেমাঙ্গিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

হেমার যে কি অসুখ, ফটিক বাবু তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—

"ও অসুখ এখনই সেরে যাবে। তুই যা পারিস্ একটা গা।"

সে কথা হেমাঙ্গিনী খাতিরেও আনিল না; চোক ঘুরাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া, তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িল।

সুন্দরীর কমকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া, কুমুদবাবু কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভদ্র লোকের অপমান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও, হেমাকে কোন কথা বলিতে ফটিক চাঁদের সাহস হইল না।

কয় বৎসর যাবৎ ভদ্রলোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, ফটিক চাঁদের চরিত্র অনেক উন্নত হইয়াছিল; হেমা যখন তাচ্ছিল্য করিয়া কুমুদ বাবুর কথায় উপেক্ষা করিল, তাঁহাকে প্রকারান্তরে অপমান করিল, তখন ফটিক চাঁদের ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল; জুতা লাথি মারিয়া হেমার মুখ ভাঙ্গিয়া দেন, মনে মনে এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল; কিন্তু ভদ্র লোকের সাক্ষাতে সেরূপ ধৃষ্টতা দেখান তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি হেমার কপট প্রেমে বাঁধা না থাকিলে, তাঁহার পঠদ্দশার সে উগ্র স্বভাব থাকিলে এতক্ষণে হেমা রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইত।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, কুমুদ বাবু তৎকালে শিষ্টাচার জানাইয়া ফটিক চাঁদকে বলিলেন,—

"আপনার সুন্দরীর অসুখ কোর্‌ছে উহাকে অন্য ঘরে শুইয়ে দিতে বলুন।"

কথা মত কার্য্য হইল। তাহার পর অন্য কথা উঠিল। সে সকল কথায় ফটিক চাঁদের কান গেল না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—

"এত দিন ধরিয়া হেমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া, শেষে কি এই ফল ফলিল! একজন বিজ্ঞ বর্দ্ধিষ্ঠ বন্ধু লোককে হেমা অপমান করিল! কুমুদ বাবু যে কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহা নহেন, তিনি হাইকোর্টের একজন এটর্ণি, বহু লোকের কাছে তাঁহার বহু সম্মান, বাগানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; আজ আমারই মেয়ে মানুষ, তাঁহাকে কি অপমানটা না করিল! ইনি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন বলিয়া এখনও এ বাগানে রহিয়াছেন, অন্য কেহ হইলে, সেই মূহুর্ত্তেই বাগান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। ফটিক চাঁদ সে ভাব তখনকার মত গোপন রাখিয়া কুমুদ বাবুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"কুমুদ বাবু আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। হেমার অসুখ। আপনার গিন্নীর একটা গান হোক্।"

কুমুদ। অসুখ ক'রেছে থাক্, আর একদিন শোনা যাবে। কাদু একখানা গা ত?

কাদম্বিনী। আমি কি ভাল গান জানি যে গাইতে পার্‌বো ?

কুমুদ। যা জানিস্ একখানা গা। আমোদ করা নিয়ে বিষয়।

কাদম্বিনী গীত ধরিল,—

(ধনি) তোমার ভয় হয় না কি মনে,

(একটু ভয় হয় না কি মনে

তুমি ভয় রাখ না মনে,)

আছে বিচ্ছেদ কাল ভুজঙ্গ পীরিতি কাম্য কাননে।

পতঙ্গ হোয়ে ঝাঁপ দিতে চাও,

পতঙ্গ হোয়ে ঝাঁপ দিবে কি আজ জ্বলন্ত আগুনে ॥

যখন এসে বংশী বেশে

যাবে চলে মুচ্‌কী হেসে

(হায় হায় তখন) জর্‌বি লো বিরহ বিষে,

আবার গুরুজনে কাড়্‌বে এসে, মর্‌বি তখন অভিমানে ॥

ফটিক। বা বেশ গাইলেন ত, আবার বলেন ভাল গাইতে জানিনি।

ফটিক বাবু কাদম্বিনীর গীত শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু কুমুদ বাবুর নিকট তাহা অগোচর রহিল না। ফটিক বাবুর অন্তরের ক্লেশের ভাব কুমুদ বাবু বিলক্ষণ বুঝিলেন; তাঁহার মনের ভিতরে যাহাই হউক না কেন, বাহিরে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদে হাস্য করিয়া তিনি ফটিক বাবুর

সঙ্গে দিব্য মিষ্ট বচনে আলাপ করিতে লাগিলেন: কথা প্রসঙ্গে কৌতূহলী হইয়া হেমাঙ্গিনীর দুই একটি পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিলেন। ফটিক চাঁদকে অপ্রস্তুত করিবার ইচ্ছায় নহে, মেয়ে মানুষের ব্যবহারে তিনি রাগ করেন নাই, এই ধারণা ফটিক বাবুর হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার ইচ্ছায়।

হেমাঙ্গিনীর পরিচয়। পুরাতন পরিচয় ফটিক চাঁদের কিছুই জানা ছিল না। মা আছে, হেমা আছে, ভালবাসা আছে, রূপ আছে, কেবল এই কথা গুলিই ফটিক চাঁদের রসনা হইতে নির্গত হইল; তাঁহার বুকের ভিতর যে আগুণ জ্বলিতে ছিল, সে অগ্নি ভেদ করিয়া আর বেশী কথা বাহির হইতে পারিল না। প্রায় শেষ রাত্রে কাদম্বিনীকে লইয়া কুমুদ বাবু নিজের গাড়িতে উঠিলেন, হেমাকে লইয়া ফটিক চাঁদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, ভৃত্যেরা ও মোসাহেবেরা অনুগামী হইল।

পঞ্চদশ উল্লাস।

"গুড়ের গুড়ত্ব গেলো।
কুলিপিটের ন্যাজ বেরুলো॥"

বাগান পার্টির অবসানে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। এক দিন রাত্রি এক প্রহরের সময় হেমাঙ্গিনীর গৃহে ক্ষুদ্র মজলিস, এক প্রকার নূতন নাটকের অভিনয়। নটের দলে ফটিক চাঁদ নটুক চাঁদ, সাতকড়ি, ভূতনাথ ও দেবেন্দ্র নাথ, নটী কেবল হেমাঙ্গিনী একাকিনী। গ্লাস বোতলের ক্রীড়া হইতেছে, মধ্যে মধ্যে গীত ধ্বনি উঠিতেছে, শোভান্তরীর সহিত ঘন ঘন করতালির শব্দ হইতেছে, কুব্জ শরীরে নটুক চাঁদ এক একবার উঠিয়া বিলাতি ধরণে লাফাইয়া লাফাইয়া তাণ্ডব জুড়িয়া দিতেছে। সকলের মুখেই পাপড়ি ভাঙ্গা গীতের ছড়া; সে অংশে হেমাঙ্গিনী নিস্তব্ধ।

দুই হাতে হেমাঙ্গিনীর দুই হাত ধরিয়া প্রেম-স্নিগ্ধ মিনতি বচনে ফটিক চাঁদ অনুরোধ করিলেন,—

"এইবার ভাই তোমার পালা।"

বাগানের মজলিসে কুমুদ বাবুর অনুরোধে হেমাঙ্গিনী যেমন মুখ বাঁকাইয়াছিল, তাকিয়ার গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছিল, এখানেও ঠিক সেইরূপ অভিনয়। ফটিকচাঁদ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, হাতে ধরিয়া সাধিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ ভাব হৃদয়ে আনিয়া রাধিকার মান ভঞ্জনের অভিনয় করিলেন, কিছুতেই হেমাঙ্গিনীর মুখ ফুটাইতে পারিলেন না। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া একটু ভ্রুভঙ্গি করিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে তিনি বলিলেন,—

"সে রাত্রে কুমুদ বাবুর প্রাণে যেরূপ ব্যথা দিয়াছিলে, আজ আবার আমার বুকেও কি সেইরূপ শক্তিশেল হানিতেছ?"

কথার ভাবার্থ কি দেবেন্দ্র নাথ তাহা বুঝিল না; কৌতুকে কৌতুকে কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিল। ফটিকের মুখে অতি সংক্ষেপে সেই প্রশ্নের উত্তর পাইল।

বাগানের মজলিসে হেমাঙ্গিনী কুমুদ বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছিল, দেবেন আজ সেই পরিচয় পাইয়া পদাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রাণতোষিণী সুরাদেবীর শক্তি অন্য দিকে ফিরিল, মহা ক্রোধে দেবেনের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, তীব্র আরক্ত নয়নে হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া সগর্জ্জনে বলিতে লাগিল,—

"এত বড় স্পর্দ্ধা। ভদ্র লোকের অপমান! চেঁদীর বেটী খেঁদী! তোদের স্বধর্ম্মই এই! বড় মানুষের কাছে থেকে যখন দু পয়সা রোজগার হয়, তখন আর গুমোরে মাটিতে

পা পড়ে না! তোকে চিন্তে কি আমার বাকী আছে? আমি অনেক দিনের পাপী, সাত হাটের কাণা কড়ি! বাবুর হিল্লেয় থেকে দু পয়সা করে নিয়েছিস্, আর অম্‌নি গুমোর বেড়ে গেছে! বাবুকেও আর গ্রাহ্য নাই। তোকে আর কি বোল্‌বো, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা, বড়ই ঘেন্নার কথা! তা না হোলে, তোর আজ কি হাল কর্ত্তুম, দেখ্‌তে পেতিস্! আমাদের বাবুর যেমন নজর বিগ্‌ড়ে গেছে, যা তা একটাকে পেলেই হোলো, তেমনি ফলও ফল্‌চে! বাবু এখন তোর কাছে গরুড় বনে রয়েচেন! তুই কি মনে ভেবেছিস্ চিরদিন তোর দিন এমনই যাবে? তা কখনই যাবে না,—এই আমি বোলে যাচ্চি, কখনই যাবে না! বাবুর মাথাটা একেবারে কেটে দিলি! দিলি কিনা একটা গানের জন্যে! তা হ'বেনা কেন? এখন পয়সা হোয়েচে! আরও কত কি হবে! বেঁচে থাকি ত দিনে দিনে আরও কত কি দেখ্‌বো!"

বলিতে বলিতে দেবেনের ক্রোধ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিল। আস্ফালন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লাফাইতে লাফাইতে হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক অধিকতর চীৎকার করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"দেখ্ হেমা, বাবু তোকে প্রাণের সহিত ভালবাসতেন, যত্ন কোত্তেন, ধামা ধামা টাকা তোর ঐ চরণে ঢেলেচেন, তার ফল কি এই! তোকেও ধিক্ তোদের জাতকেও ধিক্ তোদের ভালবাসাকেও ধিক্। কথায় যা বলে কাজেই তাই ঠিক্! এঁটো পাত

কখন স্বর্গে যায় না, তোদের জাতও কখন ভাল হয় না। তোরা দুনিয়ার নিমকহারাম! বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী! শঠ! প্রবঞ্চক! তোরা যার খেয়ে মানুষ তারই সর্ব্বনাশ করিস্! তোদের মতন নিমকহারাম আর দুটী নাই! তোদের ছায়া মাড়ালে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়! তোরা এত অপমান করিস্, এত গালাগালি দিস্ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিস্, তবু বাবুদের চৈতন্য হয় না! চক্ষু বুজে নরক-কুণ্ডে যাওয়া চাইই চাই! তোরা জানিস্ একবার ঘোর চক্রে গোলক ধাঁধায় ফেলতে পারলে হয়! তোদের ক্ষুরে খুরে দণ্ডবৎ!"

বার বার দণ্ডবৎ করিয়া দেবেন আবার বলিতে লাগিল,—

"আমাকে চেনে না কে? আমার নাম দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ। বাজারে বাজারে আমার ডাক নাম কটা দেবা, গুণ্ডা দেবা, চুয়াড়ে দেবা; আজ কাল আর একটা খেতাব বেড়ে গেছে, মোসাহেব খাতায় নাম লিখিয়ে নাম হয়েছে মোসা-দেবা!"

অতিরিক্ত চীৎকারে দেবেনের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, পাশের ঘরে গিয়া বোতল সুদ্ধ আধখানা ব্রাণ্ডি গর্ভজাত করিল; নিস্তেজ শরীর সতেজ হইল; টলিতে টলিতে আবার বৈঠকখানায় আসিল। এইবার সে দিগ্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"ফ—টি—ক—চাঁদ বাবু!—"ফটিকের" "ফ" ও নাই, চাঁদের "চ" ও নাই, আর বাবুর "ব" ও নাই! বাবুর নাম কি?—

ফটিক চাঁদ বাবু! ঘুটে কুড়নির বেটা চন্দন-বিলাস। দিদিমার বিষয় পেয়ে আজ হোয়েচেন ফটিক চাঁদ বাবু!—তা না হোলে যে হরে কলু, সেই হরে কলু। আমি কায়েত বাচ্ছা;—এক সময়ে আমাদেরও ঢের বিষয় ছেলো। ঠাকুদ্দা শালা সব উড়িয়ে দিয়ে গেছে; এখন সিং ভেঙ্গে বাতানের বাছুরের দলে মিশে গেছি! আমার গলায় দড়ি! আমার গলায় দড়ি!! আমার গলায় দড়ি!!!"

দেবেনের স্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিল,—ঘন ঘন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, দেবেন ঢলিয়া পড়িল; একেবারে অচেতন;—আর সাড়া-শব্দ রহিল না।

ষোড়শ উল্লাস।

"নোটোকে না বল্‌তে নোটো,
নোটো ধরে উল্‌টে চুলের মুটো॥"

হেমাঙ্গিনীর ব্যবহারে ফটিকচাঁদ এতদূর চটিয়াছিলেন যে, হেমাঙ্গিনীর বাটীতে তিনি আট দিন পদার্পণ করেন নাই। সেই আট দিন যে তাঁহার কি কষ্টে কাটিয়াছে, তাহা কেবল তিনিই জানেন। হেমাঙ্গিনীর সহিত অষ্টাহ বিচ্ছেদই তাঁহার এই কষ্টের কারণ। সেই কষ্টের লাঘব করিবার জন্য এই আট দিন তিনি মদে ডুবিয়াছিলেন। নিজ বাড়ীতেই মদের স্রোত বহিয়াছিল। পারিষাদগণের মধ্যে মটুক ও দেবেন দিন রাত মদ খাইয়া ঝগড়া মারামারি করিয়াছে, ফটিকচাঁদ তাহাদের ছাড়াইতে ছাড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম দুইদিন হেমার উপর রাগটা তাঁহার কিছু অধিক হইয়াছিল। সে দুই দিন দেবা-মট্‌কোর ঝগড়া মারামারি ভাল লাগিয়াছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিরক্তিভাব আসিতে লাগিল।

ফটিকচাঁদ ক্রমে বৈঠকখানায় আসা বন্ধ করিলেন, বাটীর ভিতর মদ খাইয়া শুইয়া থাকিতেন; পারিষদেরা আসিয়া, বসিয়া

বসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলে উত্তর আসিত, বাবু ঘুমাইতেছেন।

এই আট দিনেই ফটিক বাবুর গোলগাল মূর্ত্তি কৃশ হইয়া গেল, বর্ণ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল: রাহু পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিলে পৃথিবী যেরূপ তমোরাশিতে পূর্ণ হয়,—ফটিক চাঁদের অন্তর বাহির নিরানন্দ-কালিমায় সেইরূপ আচ্ছন্ন।

হেমার উপর দেবেনের গালাগালি বর্ষণের পর হইতে, ফটিক বাবু এই আটদিন যাবৎ হেমার বাড়ীতে যান নাই। হেমা ডাকিতে আসিলেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। হেমা পত্র লিখিলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতেন,—কোন উত্তর দিতেন না: হেমার উপর তাঁহার এতদূর বিতৃষ্ণা। এত বিতৃষ্ণা হইলেও, তিনি হেমাকে ভুলিতে পারেন নাই,—হেমার সে সুন্দর কান্তি, হেমার আদর, যত্ন, ভালবাসা তাঁহার হৃদয়মধ্যে অহর্নিশ জাগিয়া উঠিত। প্রথম প্রথম দুই দিন তিনি পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া, মদ্য পান করিয়া, খোস গল্প করিয়া, একরূপ ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু মোসাহেবদল চলিয়া গেলেই, একা থাকিলেই, হেমার জন্য তাঁহার প্রাণ আপনা আপনি কাঁদিয়া উঠিত। হেমা তাঁহাকে কতখানি ভালবাসে এক দণ্ড না দেখিলে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, এই সকল ভাবনা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি হেমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না: কিন্তু তাঁহার প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় স্থান পাইল না: একা থাকিলেই প্রাণ

কাঁদিয়া উঠিত,—হেমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তিনি অসহ্য বোধ করিতেন।

আজ ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় অস্থির হইলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

"আচ্ছা আমি যে হেমার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করছি, এর কারণ কি? হেমার কি দোষ? হেমার গান শোন্‌বার জন্যে কুমুদ বাবু আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। হেমার দোষ হেমা গায় নাই। কেন গায় নাই? হেমা বলিয়াছিল, অসুখ। মানুষের কি অসুখ হ'তে নাই? সে বাগানে ভাল অবস্থায় গিয়াছে ব'লে কি সেখানে অসুখ হ'তে নাই? এই যে কত লোক ব'সে ব'সে ম'রে যায়, এই আছে এই নাই—ইহাত সকলেই জানে: বিশেষ অসুখ না হ'লেই বা হেমা অসুখের কথা বল্‌বে কেন? সে কখন আমার কাছে ভুলেও ত মিথ্যা কথা কয় না, কখন আমার কথা অমান্য করে না; সে দিন অতগুলি ভদ্রলোকের মাঝে আমার অপমান করবে, ছিঃ! এ কথা মনে করাই পাপ। দোষ কারও নয়,—দোষ আমার। যদি আমি সেই সময়ে রাগ না ক'রে তার অসুখের কথা জিজ্ঞেস না করতুম, তাহ'লে সব গোল মিটে যেত: কুমুদ বাবুও সন্তুষ্ট হ'তেন, আমারও রাগ হ'ত না, হেমারও শুশ্রূষা হ'ত, সকল দিক রক্ষা হ'ত। আমি যেমন বাঁদর, একেবারে রেগে আগুন, ছোট ছোট ছেলের যে জ্ঞান আছে, যে বুদ্ধি আছে, আমার তা নাই! কুমুদ বাবু ঠাট্টা

ক'রেই হ'ক, কিম্বা সত্য ক'রেই হ'ক, হেমাকে অন্য ঘরে শুইয়ে দিতে ব'লেছিলেন। আমার তখন এত রাগ হোয়েছিল যে হেমাকে যত্ন করা দূরে থাক্, জুতো মেরে মুখ ছিড়ে দি, এমন ইচ্ছা হ'য়েছিল। সেই রাগই আমার সর্ব্বনাশের মূল। তারপর সে দিন হেমারই বাড়ীতে দেবা অনেক গালি পাড়লে,— আমার আনন্দ আর ধরে নি। মনে কর্‌লুম দিব্যি হচ্ছে; কিন্তু একবারও ভাব্‌লুম না দোষ কার? হেমা আমায় ভালবাসে আমি হেমাকে ভালবাসি, যখন এত ভালবাসাবাসি, তখন আমার অসুখে সে যদি আমায় না দেখে, তার অসুখে আমি যদি তাকে না দেখি, তা'হলে ভালবাসা কিসের? বাগানে হেমা যখন আমার আশ্রয়ে ছিল, আমি ভিন্ন সেখানে যখন হেমার আপন বল্‌বার কেউ ছিল না, তখন অসুখের সময়ে তাকে না দেখা যে কতই অন্যায় হ'য়েছে, তা এখন বুঝ্‌ছি। হেমার কথা ছেড়ে দি, হেমা আপনার লোক, অসুখে ত দেখতে হ'বেই; জ্ঞাতসারে অপর কারও অসুখ হ'লে, যিনি ভদ্রলোক হন, তিনি সব আমোদ প্রমোদ ত্যাগ ক'রে সেই রোগীর সেবায় নিযুক্ত হন। আমি এতদূর মূর্খ, এতদূর নিষ্ঠুর যে, অসুখের সময় আপনার জনকে একবার·চোখের দেখাও দেখি নি! তার অসুখটাই বা কি, সে খেলে কি না খেলে, একবার জিজ্ঞাসাও করি নি। সে অনেকক্ষণ তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়েছিল, একবারও খোঁজ করি নি! রাগেই মেতেছিলুম!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হেমাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাতের জন্য ফটিক চাঁদ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; প্রাণে বিষম যাতনা উপস্থিত হইল। যন্ত্রণার লাঘব করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ সুরাপান করিলেন। সন্ধ্যা হইবার অল্পক্ষণ বাকী, এমন সময়ে হেমাঙ্গিনীর চাকর আসিয়া ছেলাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল।

ফটিক বাবু বলিলেন,—

"লছমন্ কিসিকো চিট্টি ?

লছমন্ বলিল,—

"গিন্নিমাকো চিট্টি।"

ফটিক বাবু বলিলেন,—

"তোমারা দিদি বাবু ভালা হ্যায় ?"

লছমন বলিল,—

"দিদিবাবু আচ্ছি নেই, বেমার হুয়া।"

হেমার বেমার শুনিয়া ফটিক বাবুর মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, অতি কাতর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কয় রোজ বেমার হুয়া ?"

কথার স্বরে লছমন বুঝিল যে, দিদিবাবুর অসুখের কথা শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে; হেমার মার কথামত সে বলিল—

"আটরোজ।"

আট দিন! মনে মনে এই ভাবিয়া ফটিক স্থির করিলেন, যে আটদিন আমি যাই নাই সেই আটদিন হেমা অসুখে ভুগিতেছে!

ফটিক বাবুর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইল। ব্যাকুল হৃদয়ে পত্রখানি পাঠ করিলেন ;—

পত্র

বাবা, তুমি ভদ্দর ঘরের ছেলে, তোমায় আর কি বোলবো! হিমু আমার আটদিন মাথা তুল্‌তে পারেনি,—একজ্বরি পোড়ে আছে। বাবা, তুমি নেই কেই বা দেখে শোনে। আমি একা মেয়েমানুষ কি কোর্‌বো! তুমি বাবা কেমন আছ—একবার খপর দিলেও না, নিলেও না। তা বাবা, তুমি না দেখলে কে দেখবে? বাবা, তুমি অবুঝ নও। আর বেশী কথা কি লিখবো!

তোমারই মা।

পত্রপাঠ সমাপন করিয়া বিমর্ষভাবে লছমনকে ফটিক বাবু বলিলেন,—

"তোম্ যাও মাজীকো সেলাম দেও, হাম্ জলদি যাতা হ্যায়।"

বাবুর মন ফিরিয়াছে, দিদি বাবুর নিকট বক্‌সিস্ পাইবে, সেই আহ্লাদে লছমনের মুখ প্রফুল্ল হইল; আনন্দে আনন্দে বাবুকে সেলাম দিয়া সে ত্বরিতপদে তথা হইতে বাহির হইল, উল্লাসে উল্লাসে বাড়ীর দিকে ছুটিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ফটিক বাবু সজ্জিত হইয়া ফিটনে উঠিলেন। গাড়ী হেমাঙ্গিনীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। ফটিক বাবু ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সিঁড়ির উপর ধাপে জুতার শব্দ পাইয়া, হেমার মা বুঝিল, বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে ?—লছমন্ !"

লছমন বলিল, "বাবু আয়া।"

বাবু চাতালের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে হেমার মা। বাবুকে দেখিয়াই হেমার মা বলিয়া উঠিল,—

"কি গো বাবা, এত দিনে মনে পড়েছে কি ? আজকাল পায়া বড় ভারি ! ভাবনা কি ? পয়সা আছে, ভাবনা কি ? ঢের ঢের মিলবে ! আমার মেয়ের এই অসুখ, একটি বার কাক মুখেও খপর নিলে না ! আমার মেয়ে কুচ্ছিত, গাইতে জানে না,—নাচতে জানে না,—বাজাতে জানে না, আমার মেয়েকে পছন্দ হবে কেন ? মজলিসে বসে কখনতো গান গায়নি, নাচেনি, ওকে কি পছন্দ হয় ? আমি বুড়ো হয়েচি, সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়েস হোতে চোল্লো, এ বুড়ো মানুষের কথা যেন মনে থাকে। আজ কালের ছেলেরা কি তা মানে ? তা না মানুক, এ বুড়ো মানুষ বোলে যাচ্চে, মনে থাকে যেন, ঢের ঢের সুন্দরী পাবে, কিন্তু আমার মেয়ে সুচ্ছিরী হোক, আর কুচ্ছিরী হোক, অমন মেয়ে আর মিলবে না।"

ফটিক বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, বুড়ীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, লজ্জায় অবনতবদনে হেমাঙ্গিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী এক খানি নীলাম্বরী বস্ত্র পরিধান করিয়া

পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছে। আলুলায়িত কেশদাম ভূমি স্পর্শ করিতেছে; পীনোন্নত পয়োধরের আবরণ-বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে,—অপূর্ব্ব রূপমাধুরী প্রকাশিত হইয়াছে। হেমাঙ্গিনী একে সুন্দরী তাহার উপর নীলাম্বর পরিধান করায় তাহার সে সৌন্দর্য্য আরও অধিক বাড়িয়াছে; ঠিক যেন নীলজলে পদ্মফুল ফুটিয়াছে।

ফটিক চাঁদ ক্ষণকাল হেমাঙ্গিনীর সেই অপরূপ রূপ মাধুরী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে অতিধীরে হেমাঙ্গিনীর পদতলে গিয়া উপবেশন করিলেন। যেন কতই অসুখ এইরূপ ভান করিয়া, আঃ! উঃ! বাবারে! গেলুমরে! বলিয়া হেমাঙ্গিনী চীৎকার করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

ফটিক চাঁদ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, হেমার পাদুখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"হেমা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্; আমি তোর কাছে অনেক অপরাধে অপরাধী!"

যেরূপ হৃদয়ের আবেগে ফটিক চাঁদ এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়; কিন্তু হেমা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিরক্তি জানাইয়া রুক্ষ স্বরে বলিল,—

"ছুয়োনা,—ছেড়ে দাও!"

অধীর হইয়া সাশ্রুপূর্ণলোচন ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"কি অসুখ মাই ডিয়ার?"

হেমা চীৎকার করিয়া বলিল,—

"ছেড়ে দাও বল্‌ছি! পা ছাড়ো!"

পা দুখানি ছাড়িয়া দিয়া হেমার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাতরকণ্ঠে ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"মাই ডিয়ার! আমি কি তোর কাছে এতই অপরাধী যে, তুই আমার কথার একটাও উত্তর দিলি নি? প্রাণ যায়! চাঁদ মুখে একটি বার একটি মধুর বাণী শোন্‌বার আশায় আমার প্রাণ আকুল! বল মাই ডিয়ার, তোমার কি অসুখ হোয়েচে, একটি বার আমায় বল!"

হেমা তাহাতেও কর্ণপাত করিল না; "মা—মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল।

থাকমণি পাশের ঘরেই ছিল, মেয়ের চীৎকার শুনিয়া থপ্‌ থপ্‌ করিয়া হেমার ঘরে প্রবেশ করিল; দেখিল হেমার মুখের কাছে বাবু বসিয়া সাধ্য সাধনা করিতেছেন, মেয়ে সে দিকে দৃকপাত করিতেছে না। ইহা দেখিয়া বুড়ী মনে মনে আনন্দিত হইল, কপট ক্রোধে বলিতে লাগিল,—

"মা! মা!! মা!!! মা কি কোর্‌বে লা হারামজাদী? তোদের নিত্যি নিত্যি ঝগড়া হবে আর ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো একটা মা আছে, সে এসে তোদের ঝগড়া মেটাবে, আমার এত দায় কাঁদেনি! আমি আর এ বাড়ীতে থাকবো না; দু-চোখ যেখানে যাবে, সেইখানেই চোলে যাবো। আমার মরণ হোলেই

বাঁচি! হাড় জুড়োয়! হাড় ঝালা ফালা হ'য়ে গেল! কোথা তোর মা মাসী আছে, তারা এসে সব করুক! একেত সংসারের জ্বালা, তার ওপর নিত্যি-নিত্যি তোদের ঝগড়া, সইতে না পার্‌লে তো আর হবে না! পানে চুণ খস্‌বার যো নেই! অ৽নি রাগ! এটা খাবনা ওটা খাবনা, এ কোর্‌বো না, সে কোর্‌বো না, যেটী বায়না ধোর্‌বে, কার বাবার সাধ্যি সেটা রদ করে দেখি! ওর সাত পুরুষের বাবা এলেও সে বায়না থামাতে পার্‌বে না?"

এই সব কথা বলিয়া আড়ে আড়ে বাবুর দিকে চাহিয়া থাকমণি আবার বলিতে লাগিল,—

"বাবা, তুমি ত পরের ছেলে কোথাকার কে, তোমার সঙ্গে ত ঐ রকম হতেই পারে: মেয়েটা যখন প্রথমে এ পথে আসে, তখনকার কথা বলি, কি বোস, দুর ছাই, মনেও পড়ে না, তাদের জামাই খুব বড় মানুষ; সেই জামাই বাবুটি দেখ্‌তেও ঠিক তোমার মতন: এক দিন পাঁচজন ইয়ার বন্ধু নিয়ে এসে ওর গান শোনবার জন্যে কতই সাধাসাধি কোর্‌লে, কতই ঝুলোঝুলি কোর্‌লে: তা পোড়ার মুখী কিছুতেই গান গাইলে না; পোড়ার মুখ-খানি পুড়িয়ে চুপ্‌ কোরে বোসে রইলো! ওর স্বভাব ঐ রকম! কখন কি ঘাড়ে চাপে, তা ওর যে ঘাড় ভাঙ্‌বে, সেই জানে! দেখে দেখে আমি বুড়ো হোয়ে গেলুম, ওরকম বদ স্বভাবের মেয়ে মানুষ কোথাও কখন দেখলুম না!"

এই রকমে হেমাকে র্ভৎসনা করিয়া বুড়ী আবার বলিতে লাগিল,—

"ওঠ্ কাপড় চোপড় ছাড়্, যা পারিস্ একটু কিছু খা, বাবুর সঙ্গে ভাল মন্দ দুটো কথা ক, একটু ঠাণ্ডা হ, কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে শুকিয়ে চেহারা হয়েচে দেখ! তুইত বিয়ে করা মাগ নস্ যে, তোর জোর খাটবে; এখনই মুখে লাথি মেরে দর্প চূর্ণ কোরে চলে যাবে। তখন তোকে আবার পায়ে ধোরে ডেকে আন্‌তে হবে। এ দিকে বাবু বাবু কোরে পাগল, ওদিকে আবার তুচ্ছ কথায় অভিমান! ওঠ্ কাপড় ছাড়্, মিছরী ভিজ্‌ন আছে, একটু সরবৎ খা।"

ফটিক চাঁদ আপনাকে মহা অপরাধী জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় কুণ্ঠিত ছিলেন, সুরার তেজস্বিনী শক্তি তাঁহার মস্তিষ্কে উঠিয়াছিল, থাকমণির বাক্যে তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল; আর কি রক্ষা আছে! শ্রাবণ মাসের জলধারার ন্যায় দুটি চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল; তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন; পকেট হইতে হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া, হেমার মার পদতলে রাখিয়া বলিলেন,—

"মা! আপনার মেয়ের ঋণ এ জন্মে আমি শুধতে পারবো না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই যৎসামান্য হাজার টাকার নোট,—"

ফটিক চাঁদ আরও কি বলিতে যাইতে ছিলেন, বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইল; তিনি অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

থাকমণি বুঝিল বিষ ভাল রকমই ধরিয়াছে। হেমাকে যৎপরো-নাস্তি র্ভৎসনা করিয়া, বুড়ী অবশেষে আদর করিয়া বলিতে লাগিল,—

"মা হিমু! ওঠ্ মা, ওঠ্! কেঁদে-কেঁদে পেট ফুলে উঠেচে! শেষটা কি একটা বাড়াবাড়ি ক'রে তুলবি? ঘর কর্ত্তে গেলে স্ত্রী পুরুষে কাদের না ঝগড়া হয়? তা জামাই যখন একটা দোষ ক'রে ফেলেচে, তখন আর কি করবি বল্? ওঠ্ মা ওঠ্! জামাই আমার কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্চে, একটু গরম দুধ খেতে দে, তুইও একটু খা।"

ঝড় থামিল, কপটতার আকাশ পরিষ্কার হইল; নোট খানি তুলিয়া লইয়া, থাকমণি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ উল্লাস।

"ভাল কোর্‌তে নারি।
মন্দ কোর্‌তে পারি॥"

হেমার মা অন্য ঘরে গেল। হেমা কপট কান্না কাঁদিয়া চক্ষে অনেক জল ফেলিল। দুই হাতে দুই চক্ষু রগড়াইয়া রক্ত বর্ণ করিল। ফটিক চাঁদও কাঁদিতে ছিলেন; হেমার চক্ষে যত না জল দেখা দিল, ফটিক চাঁদের চক্ষু দিয়া তাহার চতুর্গুণ জল! তিনি হেমার অসুখের কথায় সত্য সত্যই কাতর হইয়াছিলেন। হেমা অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, শেষে বহু কষ্টে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিল,—

"বাবু! অত লোকের মাঝে অমন কোরে কি আমার অপমান কত্তে হয়? তুমি আমায় দশটা গালাগালি দিলে, দুঘা মার্‌লে, বরং ছিল ভাল; তা' হোলে বুঝতুম তোমার ভালবাসা; তুমি একটিও কথা কইলে না, আমার অসুখের কথা একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না, সেই আমার বড় কষ্ট! আমি সেই দণ্ডেই বেশ বুঝেছিলুম যে, তুমি আমায় এক তিলও ভালবাস না, তোমার ভালবাসা কেবল মুখে, অন্তরে নয়! সেই সময় যদি আমার মরণ হোতো,

তা'হোলে আমার হাড় জুড়োতো ; কিন্তু আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, অনেক অপমান আছে, সে লিখন কে খণ্ডাবে, কর্ম্ম-ভোগের জন্যে আমার মরণ হোলো না !"

এক নিশ্বাসে এই কথা গুলি বলিয়া, হেমাঙ্গিনী যেন হাঁপাইতে লাগিল : একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"মাথার রোগই আমার কাল হোলো ! হাসি খুসি করতে আমি অনেক চেষ্টা করে ছিলুম : কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় আমাকে অস্থির কোরে ছিল ! মনে করে ছিলুম, মাথার যন্ত্রণার কথা তোমায় বলি, পাছে তোমার আমোদের ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়ে কিছু বলিনি ! তত নাচ গান আমোদ আহ্লাদ চলছিল, আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না ! শ্যামী আমায় কত ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌লে আমি দুটি ঠোট এক করিনি, কোন কথার উত্তর দিই নি ! আমি জানি, যে যাই বলুক, তুমি কিছু মনে কর্‌বে না ! কুমুদ বাবু যখন আমার গান শোনবার জন্যে তোমায় ইঙ্গিত কর্‌লেন, তখন আমার মাথার ভিতর যে কি কোচ্ছেলো, তা আর কি বোল্‌বো,—মাথা যেন খোসে পড়্‌ছেলো ! কুমুদ বাবুর অনুরোধে তুমি আমায় গাইতে বোল্লে, তাও আমার মনে আছে, সবই আমি জানি ! তুমি আমোদে এত টাকা খরচ কোচ্ছো, দশ জনকে নিমন্ত্রণ করেছ, কোথায় আমি দশ জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বো, নেচে গেয়ে রঙ্গ কোরে সকলকে খুসী কোর্‌বো, তা না কোরে আমি চুপটি কোরে বোসে থাক্‌লুম, এটা

কি কম দুঃখের কথা ! তুমি আমার উপর রাগ কোরেছ, সে জন্যে আমার কোন কষ্ট হয় নি, তুমি যে আমার সঙ্গে একটীও কথা কওনি সেই দুঃখই আমার বড় ! তুমি পুরুষমানুষ, তোমার টাকা আছে, লোকবল আছে, মানসম্ভ্রম আছে, সবই আছে ; তুমি মনে কর্‌লে আমার মতন দশটা মেয়েমানুষকে পুষ্‌তে পার : আমি আমার নিজের পেটের জন্যে পরের মন যোগাই ; তোমাতে আমাতে এত প্রভেদ,—স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ ! আজ যদি তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তা হোলে আমাকে কালই লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে কোরে বেড়াতে হ'বে ! তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা ? তা হয় না ! তবে কি না তোমায় আমি বড় ভালবাসি : আমার হৃদয় যদি দেখাবার হোতো, বুক চিরে দেখাতুম, আমি তোমায় কত খানি ভালবাসি !"

এই সব কথা বলিয়া হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীকে ধরিয়া বসাইলেন, হেমাঙ্গিনী ফটিক চাঁদের পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল,—

"বাবু গো ! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ ! আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধে অপরাধী ! বাগানে সে দিন আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিয়েছি সে জন্যে তুমি আমার অপরাধ নিও না, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর ! বল, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোর্‌বে ? বল, রাগ কোরে দাসীকে পায়ে ঠেলবে না ? তা না বল্লে আমি এই দণ্ডেই তোমার পায়ে রক্ত গঙ্গা হব !"

এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজের বস্ত্রাঞ্চল নিজের গলদেশে বেষ্টন করিল, দুই হস্তে সেই বস্ত্র সজোরে টানিতে লাগিল, অস্থির হইয়া শয্যায় শয়ন করিল, দুই চক্ষু কপালে তুলিল, জিহ্বা বাহির করিল, গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

হেমার ইত্যাকার অবস্থা দর্শন করিয়া ফটিক চাঁদ অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, হেমা বুঝি সত্য সত্যই মরে, এই ভাবিয়াই অধিক ভয়। হেমার দুই হাত ধরিয়া অঞ্চল হইতে হাত ছাড়াইবার জন্য তিনি অনেক ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন, অতি বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হেমা! তোর পায়ে পড়ি, তুই মরিস্ নি! তোর কোন দোষ নাই, আমারই সব দোষ! তুই আর আমায় বিপদে ফেলিস্ নি, আমায় ফাঁসি কাঠে ঝোলাস্ নি! তোর পায়ে পড়ি, আঁচল ছেড়ে দে!"

হেমা আঁচল ছাড়িল না। ফটিক তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া "মা—মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—

"মা! মা!! শীগ্‌গির আসুন শীগ্‌গির আসুন! আপনার মেয়ে কি রকম কোচ্চে!"

থাকমণি থপ্ থপ্ করিয়া দৌড়িয়া হেমার ঘরে প্রবেশ করিল; হেমার অবস্থা দেখিয়া বুঝিল যে, হেমা এ পথের উপযুক্তই বটে। বাবুকে কি করিয়া বশ করিতে হয়, হেমা তাহা বেশ শিখিয়াছে;

একটা কথা বলিলেই হেমা সব বুঝিয়া লয়। এই ভাবিয়া বুড়ী মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া পদাহত সাপিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া মুক্তকণ্ঠে ফটিক চাঁদকে বলিল,—

"তুমি কেমন ভাল মানুষের ছেলে গা! আমার মেয়েকে একেবারে মেরে ফেলেচ! মেয়ের আর পদার্থ আছে কি!"

এই বলিয়া মায়াবিনী তৎক্ষণাৎ চক্ষে অঞ্চল দিল।

ফটিক চাঁদ ভয়ে হেমার হাত ছাড়িয়া দিয়া থাকমণির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—

"মা! আপনার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমি হেমাকে কিছুই বলিনি! সে দিন বাগানে আমি আপনার মেয়েকে বড্ড অযত্ন কোরে ছিলুম, সেই দুঃখেই হেমা আজ গলায় আঁচল দিয়ে মোর্‌বে ঠিক কোরেচে; আমি কিছুতেই আঁচল ছাড়াতে পাচ্চি না! ঐ দেখুন, চোখ দুটি কপালে তুলেছে! আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করুন! আমি আপনার পায়ে ধোরে দিব্বি গালচি, আর কখনও আমি হেমাকে একটুও অযত্ন কোর্‌বো না।"

এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া ফটিক চাঁদ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। হেমার মা বেশ বুঝিল যে, হেমার উপর ফটিক চাঁদের বিশ্বাস পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে; তথাপি ফটিক চাঁদের মন বুঝিবার জন্য র্ভৎসনাচ্ছলে বলিল,—

"তা এতে মেয়েত মর্‌তেই পারে! আমার মেয়েকে অপমান কর্‌তে বাকী রেখেছ কি? আমার মেয়ে এপথে এসেছে বোলেই কি এত কোরে লাঞ্ছনা কোর্‌তে হয়? তা তুমি যদি বাবা দশটা গাল দিতে, দশ ঘা ধোরে মার্‌তে, আমার মেয়ে সব সহ্যি কোরতো, তা নয়, চাল চুলো নেই, একটা পয়সা রোজগার কর্‌বার ক্ষেমতা নেই, সেই হতভাগা হতচ্ছাড়া দেবা কিনা, আমার দুধের মেয়েকে যাচ্ছেতাই গাল মন্দ দিয়েছে! আমার সাম্‌নে গালাগালি দিতে পার্‌তো, তা হোলে বুঝে নিতুম, কেমন সে মায়ের দুধ খেয়েছে,—কেমন সে এক বাপের বেটা, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম! তুমিত বাবু একটা কথাও কওনি! তোমার ভরসাতেই মেয়েকে বাগানে পাঠিয়েছিলুম, তুমি এমন ধারা মানুষ জান্‌লে ওকে সাত জন্মেও পাঠাতুম না! ওমা! তোমায় আমি খুব ভাল বোলে জান্‌তুম্, তোমার পেটে এমন মিছরির ছুরি, তা আমি জানতুম্ না। আচ্ছা বাবা, তোমায় জিজ্ঞেস করি, রাগ কোরোনা বাবা, তোমারই ভালর জন্যে বল্‌ছি, বল দেখি, এই যে হাড়ী মুদ্দোফরাস দিয়ে আমার মেয়েকে অপমানটা করালে, এ অপমানটা কার? হেমার না তোমার? তোমারই অপমান। লোকে হেসে হেসে বোল্‌বে, অমুক বাবুর মেয়ে-মানুষ আজ খুব জব্দ হোয়েছে, খুব গালাগাল খেয়েছে! আমরা লেখা পড়া শিখিনি, কিন্তু আমাদের যা বুদ্ধি আছে, তা তোমরা এত লেখা পড়া শিখেছ, তোমাদের সে বুদ্ধি নেই! তা বল্লে কি হয়, যে যেমন অদেষ্ট করেচে, সে তেমনি ফলভোগ করে।

আমার অদেষ্ট মন্দ ! তা না হোলেই বা তোমারই সামনে আমার মেয়ের তেমন দুর্দ্দশা হবে কেন ? কথাতেইত আছে "অদেষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়।" তোমার অদেষ্ট ভাল, তুমি খুব আমোদ আহ্লাদ কোরে খুব নাম ডাক কিনে নিয়েচ ; আর আমাদের অদেষ্ট মন্দ আমরা পোড়ে পোড়ে লাথী ঝাঁটা খেয়ে মলুম ! তুমি আর মুখ নেড়োনি ;—তুমি যে আমার মেয়েকে কত ভালবাস, তা এক আঁচড়েই বোঝা গেছে।"

এই বলিয়া হেমার মা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল।

হেমার মার মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনিয়া, ফটিক চাঁদের নেশা ছুটিয়া গেল ; মনে মনে তিনি ভাবিলেন,—

"কি কুক্ষণেই বাগান পার্টি দিয়ে ছিলুম। পার্টিতে না ঢেলে সে টাকা গুলি যদি হেমাকে দিতুম, তা হোলে আজ এ বিভ্রাট ঘট্‌তো না, হেমার মার এত লাঞ্জনা গঞ্জনা ভর্ৎসনা সইতে হোতো না ; এত টাকা খরচ করলুম, সব পণ্ড হোয়ে গেল, জাত গেল, কিন্তু পেট ভোরলো না !"

মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, হেমার মার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া, ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"মা ! হেমাকে আগে বাঁচান, তার পর যা বল্‌বার হয় বোল্‌বেন।"

হেমার মার যেন চেতন হইল, কপট দুঃখে চীৎকার করিয়া বলিল,—

"তাইত গো! আমার মেয়ে কি হোলো গো! দেখ্‌চ কি! শীগ্‌গির জল দাও! শীগ্‌গির জল দাও! বাতাস কর!"

ফটিক চাঁদ তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল লইয়া, হেমার মাথায়, মুখে চোখে ছিটাইয়া দিয়া, হেমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

হেমার কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে আদরের ডাক ডাকিয়া থাকমণি বারংবার বলিতে লাগিল,—

"হিমু—অহিমু—মা আমার! একবার চোক চাও মা!—এই আমি তোমার মা এসেছি! একবার চোখ চেয়ে দেখ মা!"

ফটিক চাঁদ সেই সময়ে মনে মনে ভগবানের নিকট হেমার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

মার গলার স্বর কানে প্রবেশ করিবা মাত্র, হেমার যেন ঘুম ভাঙ্গিল; আস্তে আস্তে চোখ চাহিল, মৃদুস্বরে বলিল,—

"তুই এখানে কেন মা! আমার কি হোয়েচে মা।"

মা বলিল,—

"কেন মা! এই যে আমি মা! তোর কাছে মা!—জামাই পাশে দাঁড়িয়ে যে মা!—জামাইকে নমস্কার কর্‌ পায়ের ধূলো নে! সব ভাল হোয়ে যাবে! ভয় কি মা!"

হেমা অতি কষ্টে দুই হাত তুলিয়া ফটিক চাঁদকে নমস্কার করিল; ফটিক চাঁদের আনন্দের সীমা রহিল না, থাকমণিকে তিনি বলিলেন,—

"এখন কেমন দেখছেন মা? আর কোন ভয় নাই ত মা?"

হেমার মা হাসিয়া ফটিকচাঁদের দিকে মুখ করিয়া বলিল,—

"বাঁচা গেল,—আর ভয় নেই,—ভয় কেটে গেছে,—মেয়েটা আর একটু হোলেই যেত।"

হেমার মুখেও হাসি দেখা দিল। ফটিক চাঁদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হেমা বলিল,—

"মা, আমি বাইরে যাবো।"

ফটিক চাঁদ অমনি আগ্রহের সহিত বলিলেন,—

"এখন একটু শুয়ে থাকো, তার পর একটু সামলালে যেও।"

হেমা বলিল,—

"আমি এখন যেতে পার্‌বো।"

থাকমণি বলিল,—

"তবে মা! আস্তে আস্তে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে আয়!"

মায়ের কাঁধে মাথা দিয়া হেমা আস্তে আস্তে বাহিরে গেল। প্রিয়তমাকে সুস্থ দেখিয়া ফটিক চাঁদ উপর্য্যুপরি তিন পাত্র তীব্র সুরা উদরস্থ করিলেন, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, হেমার ভক্তি ভালবাসা চিন্তা করিতে করিতে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ঘর হইতে বাহিরে যাইবা মাত্র হেমার সকল রোগ, সকল অসুখ কোথায় উড়িয়া গেল, সে তখন এক দৌড়ে মার ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর নেপাল। নেপাল সেখানে কি করিতেছিল? সে ভাবিতেছিল,—

"শালা আবার এসেছে! এ আট দিন নিষ্কণ্টকে বেশ স্ফূর্ত্তি করা যাচ্ছেলো, শালা এসে সে রসে ভঙ্গ দিলে! আমি বাগানে ছিলুম না, সেই জন্যে হেমা বলে, সেখানে সে গান গায় নি, আমার ভাবনাতেই অসুখের ভাণ ক'রে শুয়ে পড়ে ছেল, শালীর সব মিছে কথা; সে কথা যদি সত্যি হোতো, তবে আজ কেন ফটকে শালাকে তাড়িয়ে দিলে না? বাবা! রূপেয়া বড় শক্ত চীজ!"

নেপালের মনে এই প্রকারের নানা ভাবনা। হেমাঙ্গিনীকে সম্মুখে দেখিয়া নেপাল চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—

"শালা এখন ঘুমচ্চে, না জেগে আছে?"

হেমা বলিল,—

"তোর সে খোঁজে দরকার কি? আমি যখন তোর সহায়, তখন তোর এত ভয় কিসের?"

নেপাল কি বলিতে যাইতেছিল, হেমা তাহাতে বাধা দিয়া বলিল,—

"চুপ! গলা শুনতে পাবে।"

নেপাল আর কোন কথা বলিল না।

হেমা দেখিল, বুড়ী তাহার জন্য খাবার চাপা দিয়া রাখিয়াছে। হেমা বসিল, নেপালের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইল, খাবারের ঢাকা খুলিল, দেখিল, পান্তা ভাত, আর এক ধারে একটু নোনা মাছের টক।

হেমার ইচ্ছা ছিল, দুই জনে একত্রে আহার করিবে, কিন্তু তরকারির ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার সে ইচ্ছা ডুবিয়া গেল, নেপালকে কোন কথা বলিল না,—সে নিজেই পান্তা খাইতে বসিল।

নেপাল ছাড়িবার পাত্র নহে, থাবা থাবা পান্তা ভাত গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পান্তা গুলি যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় অদৃশ্য !

পান্তা ভোগের পর নেপালের সহিত অল্পক্ষণ রসালাপ করিয়া হেমাঙ্গিনী বিদায় লইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, কাম-কটাক্ষ-সন্ধানে নেপালের দিকে বাণ বর্ষণ করিতে করিতে নিজের শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

ফটিক চাঁদ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। শয্যায় উপবেশন করিয়া হেমাঙ্গিনী সুকোমল করস্পর্শে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। ফটিক চাঁদ হাসিয়া বলিলেন,—

"কেমন আছ ?"

হেমাঙ্গিনী এক গাল হাসিয়া বলিল,—

"বেশ আছি।"

ফটিক চাঁদ আদর করিয়া বলিলেন,—

"একটু গরম দুধ খেলে ?"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল,—

"খেয়েছি।"

অষ্টাদশ উল্লাস।

"খোঁড়াকে না বোলবে খোঁড়া।
আস্তে আস্তে বোলবে তারে, পা ছুটি তার কেন মোড়া॥"

এই ঘটনার আট দিন পরে ফটিক চাঁদ নিজ বাড়ীর বৈঠক-খানায় উপবিষ্ট। বেলা অষ্টম ঘটিকা। মটুকচাঁদ, সাতকড়ি, ভূতনাথ ও দেবেন, এই চারিজন মোসাহেব তাহাদের বাবুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে; ছুই জন উড়ে বেহারা মুহুর্মুহুঃ পান তামাক যোগাইতেছে। বেহারাদের মুখে আজ আনন্দ ধরে না। কেননা বাবু যে যে দিন প্রাতঃকালে বৈঠকখানায় বসেন, সেই সেই দিন অনেক রকম জিনিষ কিনিবার ফরমাস হয়; তাহারাই বাজার সরকারী করে, কাজেই তাহাদের বেশ দু পয়সা রোজগার হয়। ফটিক বাবুর মহৎ দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, তিনি জিনিষ কিনিবার জন্য মোসাহেবদের কিম্বা বেহারাদের হাতে যখন যত টাকা দেন, তাহার আর হিসাব লন না; বাজার করিয়া যাহা বাঁচে, তাহাও ফেরৎ চাহেন না। বেহারারা আজ বাজার করিবে, মনের মত রোজগার করিবে, সেই কারণেই তাহাদের আনন্দ।

এই স্থলে একটি ছোট কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। দুই জন বেহারা এক সঙ্গে বাজার করে, উপরি লাভ যত হয়, দুই জনেই ভাগ করিয়া লয়। সময়ে সময়ে ভাগের পয়সা লইয়া দুই জনের ভয়ানক ঝগড়া হইত; সময়ে সময়ে মারামারিও হইয়া যাইত। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে ফটিক বাবুর কানে উঠিত; তিনি তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন।

সে দিন প্রাতঃকালেই মদের মজলিস্। মোসাহেব বেষ্টিত ফটিক চাঁদ বোতল গেলাস লইয়া বসিয়া গিয়াছেন।

দেবেনকে সম্বোধন করিয়া উপহাসচ্ছলে বাবু বলিলেন,—

"দেখ দেখি মটুক বাবুর আজ কেমন বাহার খুলেছে। গায়ে ফরাসি ছিটের জামা, চুড়িদার আস্তিন, কোঁচান কালপেড়ে ধুতি, ফুল কাটা চাদর, পায়ে কাঠবেড়ালি রঙের ষ্টকিং, মাথার মাঝখানে তিন-ভাগ-করা সিঁতি; এমন না হলে কি মটুক বাবুকে মানায়! এমন সাজ না হোলে কি মটুক বাবুকে সাজে? বাবু ত মটুক বাবু! আর সব বাব্বিয়া।"

প্রশংসা শুনিয়া মটুক চাঁদ আহ্লাদে ফুলিয়া উঠিল, মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সাতকড়ি ও ভূতনাথ অমনি বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবুত ত মটুক বাবু। আর সব বাব্বিয়া!"

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, মটুকের সহিত দেবেনের বাদা-বাদি ছিল; যেন তেন প্রকারে মটুকের সহিত ঝগড়া করিবে,

এই দেবেনের মতলব। মটুককে রাগাইবার মতলবে দেবেন বলিল,—

"শালা কুঁজো একেবারে নবাব বোনে গেছে! চুড়িদার আস্তিন, ফুলদার চাদর আর পায়ে মোজা ভিন্ন এ নবাব আজকাল আর পথ চলে না! কি আমার নবাব গো! পেটে ভাত নেই গোঁফে আতর।"

মটুক চটিয়া উঠিল; সক্রোধে বলিল,—

"দেখ্ দেবা, আমায় আর যা বলিস্ বল্, নবাব বলিস্ নি বল্‌ছি! আমি কি মুচুরমান যে, নবাব বোনে গেছি?"

মটুকের রাগে দেবেনের আরও সুবিধা হইল। দেবেন হাসিয়া বলিল,—

"আলবাৎ মুচুরমান!"

মটুক আরও রাগিয়া রাগিয়া বলিল,—

"দেখ্ দেবা,—কটা,—গুণ্ডা, ভাল হবেনা বল্‌ছি!"

দেবেন আরও মজা পাইল, হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল,—

"তুই রাগ কর্ আর যাই কর্, তুই নিশ্চয়ই মুচুরমান। তার সাক্ষী তুই যখন তখন কাচা খুলে বেড়াস্; এইত একটা হাতে হাতে প্রমাণ; আর কত শুন্‌তে চাস্? একে একে শোন্,— মুচুরমান,—এই কথার প্রথম অক্ষর 'ম', তোর নামেরও প্রথম অক্ষর 'ম'; তারা জল শৌচ করে মগে, তাতেও 'ম'; মুচুরমানের

পণ্ডিতকে বলে মুন্সী, তাতেও 'ম'; বড় পণ্ডিতকে বলে মৌলভী, তাতেও 'ম'; যারা সিন্নি দেয়, তাবিজ পড়ে, তাদের বলে মোল্লা,—তাতেও 'ম'; গোর দেওয়াকে বলে মাটি,—তাতেও 'ম'; তীর্থস্থান মক্কা, তাতেও 'ম'; দেবতাকে বলে মহম্মদ, তাতেও 'ম'; পার্ব্বণকে বলে মহরম,—তাতেও 'ম'; ধর্ম্মমন্দিরকে বলে মস্‌জিদ, তাতেও 'ম'; তোর নামের গোড়ায় ত 'ম' আছেই; তবে তোকে নবাব বলাতে আমার কি দোষ দেখ্‌লি বল্‌।"

দেবেনের যুক্তি শুনিয়া ফটিক বাবু ভারি খুসি হইলেন, উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—

"বাহবা! বহুত আচ্ছা! মোট্‌কোকে বেশ মুচুরমান বানিয়েছ। ওকে নিয়ে আর খাওয়া হবে না! মট্‌কো মুচুরমান!"

সাতকড়ি ও ভূতনাথ অমনি চীৎকার করিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গীত ধরিল,—

"মট্‌কো মুচুরমান আমাদের মট্‌কো মুচুরমান!
ঠাণ্ডি পোলাও, বেগুণকা কাবাব! নিত্যি নিত্যি খান!"

মটুক পূর্ব্ব হইতেই রাগিয়াছিল, এখন উহাদের নৃত্য গীতে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল, বলিল,—

"আমার রাগ আর বাড়াস্‌নে বল্‌ছি! এ কুঁজোকে এখনও চিন্তে পারিস্‌ নি! এখনই নিজের মাথা ফাটিয়ে তোদের সকলকে বাঁধাবে!"

সাতকড়ি ও ভূতনাথ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, মটুকের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া, ঘাড় মুখ বাঁকাইয়া আরও চীৎকার করিয়া গান ধরিল,—

"মট্‌কো মুচুরমান—আমাদের মট্‌কো মুচুরমান !
ঠাণ্ডি পোলাও বেগুণকা কাবাব, নিত্যি নিত্যি খান।"

ক্রোধান্ধ হইয়া মটুক চাঁদ একটা মদের বোতল তুলিয়া লইয়া, নিজের মাথায় সজোরে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। দেবেন সে সময়ে তাহার হাত ধরিয়া না ফেলিলে, সত্য সত্যই একটা ভয়ানক রক্তা-রক্তি ব্যাপার ঘটিত।

উহাদের রহস্য দেখিয়া ফটিক বাবু এতক্ষণ আনন্দ করিতে-ছিলেন, কিন্তু মটুক সত্য সত্যই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, সুরসিক নট দুটিকে গান থামাইতে বলিলেন, তাহার পর মিষ্ট কথায় মটুককে শান্ত করিয়া বলিলেন,—

"তুই যেমন পাগল, ওরাও তেমনি তোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। নে,—এক গেলাস টেনে নে,—মাথা ঠাণ্ডা কর্।"

এই বলিয়া বাবু স্বহস্তে এক গেলাস মদ ঢালিয়া মটুকের হস্তে দিলেন, তাহার পর সকলেই মদ খাইলেন; মদের মোহিনী শক্তিতে মটুকের রাগ পড়িল, আবার হাসি দেখা দিল।

ফটিক বাবু নিজাসনে বসিয়া হাঁকিলেন,—

"ভাগা ! ভোলা ! কে আছিস্‌রে, তামাক দিয়ে যা।"

"যাউচি বাবু, যাউচি বাবু" বলিয়া ভাগবত ও ভোলানাথ দুইজনে দুইটি কলিকা লইয়া দুই দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল।

ফটিক বাবু ঐ দুইটি উৎকলবাসী লইয়া মধ্যে মধ্যে রহস্য করিতেন। আজ একটা নূতন রহস্যের অবতারণা:—দুইজন বেহারার মধ্যস্থলে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—

"চার বোতল সোডা নিয়ে আয়।"

ভাগবত ও ভোলানাথ দুইজনেই টাকা কুড়াইতে গেল। ভাগবত তাড়াতাড়ি টাকাটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল,—

"বাবু সোটা জড়-অ?"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"হাঁ-হাঁ, চার বোতল সোডা।"

ভাগবত দৌড়িল। ভোলানাথ তাহার পিছু পিছু ছুটিল। ফটিক বাবু হাসিতে লাগিলেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে একটা গোল উঠিল। ভাগবত চাৎকার করিয়া গালি দিতেছে,—

"শড়া চটকটা মারিলা, বিধা মারিলা, মুকি মারিলা, টঙ্কা কাড়ি নিলা, গালি দিলা, গাঁড়িপ শঁড়া কাঁহিকো মতে টঙ্কা কাড়ি নিলা, মারি কিরি তালু ফাটি দিব। মু বাবু পাকু যাইকিরি নালিশ-অ করিব-অ।"

ফটিক বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"এই কিষ্কিন্ধের ঝগড়া লেগেছে।"

চীৎকার করিতে করিতে, ভগবত ঊর্দ্ধশ্বাসে ফটিক বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—

"বাবু ভলা মোকে চটকণা মারিলা, বিধা মারিলা,—মুকি মারিলা, টঙ্কা কাড়ি নিলা, গালি দিলা কাঁই? আপঅনি ইহার বিচার করিবে।"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"তুই বেটা, ভোলার জোরে পারিস্‌নি?"

ভাগবত বলিল,—

"মুই ভলার-অ জোরে পারিম্নি না, ভলার-অ বড্ড জোর অছি। আপনি মোকে জড়-অ কিনিতে দিল, ভলা মোর হাত হোতে টঙ্কা জোড় করি কাড়ি নিলা।"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"ডাক্ কিষ্কিন্ধেকে ডাক্।"

ভাগবত খড়খড়িতে মুখ বাড়াইয়া কাঁদ কাঁদ সুরে ডাকিল,—

"হো ভলা ভাই, হো ভলা ভাই-ই, বাবু ডাকিচি, আস ধাঁইকিড়ি।"

চারি বোতল সোডা লইয়া, ভয়ে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভোলানাথ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

ফটিক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিরে ভোলা! তুই ভাগাকে মার্‌লি কেন হারামজাদ?"

ভোলা কোন উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ভোলাকে অপরাধী বুঝিয়া, ফটিক চাঁদ হুকুম দিলেন,—

"ভাগা, আচ্ছা কোরে ভোলার দুটো কান মোলে দে।"

তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল হইল। ফটিক চাঁদ খুসি হইলেন; ভোলার নিকট হইতে টাকার বাকী পয়সা ফেরৎ লইয়া ভাগবতকে বকসিস্ দিলেন।

আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে ভাগবত তিন লাফে সিঁড়ি পার হইয়া নীচে নামিয়া গেল, আর ভোলা কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিমর্ষ ভাবে "শঁড়া, কান ছিঁড়ি দিলা, কান ছিঁড়ি দিলা" বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

ফটিক বাবুর রহস্য এইরূপই ছিল; কখন বা ভাগবতকে ভোলার দশায় ফেলিয়া তিনি আজিকার মত মজা দেখিতেন।

উনবিংশ উল্লাস।

"পাঁচ দিন চোরের।
এক দিন সাধের॥"

দেখাবি?

দেখাব।

দেখাবি?

দেখাব।

দেখাবি?

দেখাব।

দেবেনের সরল উত্তরে ফটিক চাঁদ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"যদি না পারিস্ তবে?"

দেবেন। তবে আমার নাম দেবাই নয়।

ফটিক। ঠিক বল্‌ছিস্?

দেবেন। হাঁ ঠিক্ বল্‌ছি।

ফটিক। কবে দেখাবি?

দেবেন। যখনই বল তখনই পারি, তবে কি না, কিছু টাকার দরকার।

ফটিক। কত ?

দেবেন। পঞ্চাশ।

ফটিক চাঁদ তৎক্ষণাৎ দেবেনের হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন ; টাকা দিলেন বটে, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার যে অকপট বিশ্বাস, তাহা একটুও টলিল না।

দুইজনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাস্তায় একটা কাবুলির বজ্রগম্ভীর ধ্বনি তাঁহাদের কানে গেল,—

"আব্বি মেরা রুব্বি লেয়াও।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্ষীণ স্বর,—

"লাগে লাগে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

"হাম্ নেহি ছোড়েগা, গর্দ্দানা পাকড়্কে আদায় করেগা।"

"কাল কি পরশু রোজ দেগা।"

"হাম্ কব্বি নেহি ছোড়েগা। তোম্ ইধার উধার ভাগ্তা হ্যায়, রেণ্ডী বাড়ীমে ঘুঁস্তা হ্যায়, তোম্ শালা চোট্টা হাম্ জান্তা হ্যায়, হাম্কো আবি রুব্বি দেও।"

"আবি হামারা পাস নেহি হ্যায়, হাম্ বোল্তা হ্যায়, দু-চার রোজ বাদ দেগা।"

"যো রোজ তোম্কো পাকড়াতা হ্যায়, তোম্ একই বাৎ বোল্তা হ্যায়। যব্ নেহি দেগা, তব্ কেয়া হোগা ?"

"হামারা ধুতি কাড়্ লেগা!"

"ধোতি হাম্ কেয়া করেগা, রুব্বি দেও! হামারা গলামে ছুরি লাগায় দেগা, তব্ রুব্বি নেহি ছোড়েগা।"

একটা তৃতীয় স্বর শ্রুত হইল,—

"তোম্ এত্তা জুলুম্ কর্তা হ্যায় কাহে?"

কাবুলি বলিল,—

"দেখো বাবু, সাত মাহিনা হুয়া ছ' রুব্বিকা একঠো কাপড়া লে লিয়া, দো রুব্বি দিয়া, আউর কুছ্ নেহি দেতা হ্যায়। হামকো দেখ্‌কে ইধার উধার ভাগ্‌তা হ্যায়। আজ বহুৎ ঢুড়্ ঢুড়্ কর্‌কে উস্কো হিঁয়া পাক্‌ড়ায়া। হাম্ নেহি ছোড়েগা।"

তৃতীয় স্বর একটু নরম হইল,—

"তোম্ উসিকো বেইজ্জৎ মৎ কিয়ো, আদালতমে যাও।"

আদালতের কথা শুনিয়া, কাবুলি রাগিয়া উঠিল, বলিল,—

"তোম্ কোন্ হ্যায়? হাম্ কিসিকো পাস্ রুব্বি পাওয়েগা, উসিকো হাম্ পাকড়ায়া; তোম্ যাস্তি বাৎ মৎ কিয়ো। ও লোগ রুব্বি নেহি দেগা, তোম্ দেওগে?"

তৃতীয় স্বর,—

"হাম্ উস্‌কো আস্তে জামিন্ হ্যায় যো হাম্ দেগা?"

কাবুলি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল, ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিল,—

"তব্ তোম্ কাহে বাত্ কর্‌তা হ্যায়, চুপ্‌চাপ চলা যাও,

তোম্ দোস্‌রা বাৎ কিয়েগা, তোম্‌কোভি গলামে কাপ্‌ড়া দেকে বে-ইজ্জৎ করেগা।"

তৃতীয় স্বর আর শ্রুত হইল না; প্রথমের সেই ক্ষীণের স্বর কতকটা উচ্চ হইয়া উঠিল,—

"বড্ড লাগে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

সেই স্বর শ্রবণে চকিত হইয়া, দেবেনের মুখপানে চাহিয়া, ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"এ মটুকোর গলা নয়?"

দেবেন বলিল,—

"হাঁ, সেই রকম ত শুন্‌চি।"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"চল চল, দেখিগে ব্যাপারখানা কি!"

দেবেন বলিল,—

"চলুন।"

ফটিক চাঁদ ও দেবেন উভয়ে দ্রুতপদে চলিলেন, রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন, লোকারণ্য। এক বিকটাকার কাবুলি মটুকের গর্দ্দান এমন করিয়া ধরিয়াছে যে, মটুকের নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই; মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে, চোক দুটী কপালে উঠিয়াছে।

কোন বলবান বৈরীর হস্তে একজন বাঙ্গালীকে বিপন্ন দেখিলে, শত শত বাঙ্গালী তফাতে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে; কাবুলির হস্তে একজন বাঙ্গালী লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহা দেখিবার

জন্য সেখানে যত লোক জমা হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ তামাসা দেখিতেছিল ; ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে সাহস করে নাই। দেশের এখন এইরূপ দুর্দ্দশা !

কাবুলির জোর জার কথা শুনিয়া, দেবেন পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে মটুকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল ; কাবুলির সম্মুখীন হইয়া বজ্র-নিনাদে বলিল,—

"ছোড়্ দেও !"

সেই সময় মটুকও দেবেনকে দেখিয়া গোঁ-গোঁ করিয়া বলিল,—

"দেবা তোর পায়ে পড়ি আমায় বাঁচা।"

মটুককে কাবুলির হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইবার জন্যই দেবেন সেই কাবুলির সম্মুখীন হইয়াছিল। দেবেন যখন "ছোড়্ দেও" বলিল, তখন কাবুলি ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিল,—

"হাম্ বহুৎ শালা বাঙ্গালীকো দেখা, রুব্বি লেগা তব ছোড়েগা।"

দেবেন বলিল,—

"আগাড়ি ছোড়ো, পিছু যো বাৎ হায় বোলো।"

কাবুলি রাগিয়া বলিল,—

"হাম্ নেহি ছোড়েগা।"

এইবার দেবেনের রাগ অসহ্য হইল। সে কাবুলির গর্দ্দান

সজোরে ধরিল। কাবুলির আর নড়িবার শক্তি রহিল না। সে মটুকের যে দুর্দ্দশা করিয়াছিল, দেবেনের হাতে তাহার নিজের তখন সেইরূপ দুর্দ্দশা। মটুককে ছাড়িয়া দিয়া কাবুলি তখন নিজের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"ছোড়্ দেও বাবু, ছোড় দেও, হামারা কসুর হুয়া, মাপ কিজিয়ে, ছোড়্ দেও বাবু!"

বলিতে বলিতে কাবুলিটা তাহার মাথার পাগড়ী খুলিয়া দেবেনের পদতলে নিক্ষেপ করিল। দেবেনের দয়া হইল। কাবুলিটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সগর্জ্জনে বলিল,—

"নিকালো শালা!"

"হাম এত্না বরিষ কল্কাত্তামে আয়া, বাঙ্গালীকো এত্তা জোর, এত্তা মর্দ্দানা, কব্বি নেহি দেখা।"

এই বলিয়া দেবেনকে সেলাম ঠুকিয়া কাবুলি তখন পাগড়ী উঠাইল।

ফটিক চাঁদ কাবুলিকে ডাকিয়া, তাহার পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিলেন। কাবুলি সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিল।

———

বিংশ উল্লাস।

"অবোঝকে বোঝাব কত বোঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিকে বোঝাব কত নিত্যি ধান ভানে।"

কাবুলির কবল হইতে মটুক চাঁদ যে দিন মুক্ত হয়, তাহার পরদিন রাত্রি আটটার সময় হেমাঙ্গিনীর ঘরে ফটিক চাঁদ।

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল,—

"আজ আমার কি সৌভাগ্যি! এত সকাল সকাল চাঁদের উদয়!"

ফটিক। নিমন্ত্রণ আছে।

হেমাঙ্গিনী। কোথায় বাবু?

ফটিক। বন্ধুর বাড়ী।

হেমা। (মৃদু হাসিয়া) আমার মতন বন্ধু নাকি?

ফটিক। দূর্ শা—!

হেমা। কি রকম বন্ধু বাবু?

ফটিক। ভদ্রলোক।

হেমা। বাড়ী না বাগান?

ফটিক। বাড়ী।

হেমা। ন্যাকামি রেখে দাও বাবু?

ফটিক। মাইরি বল্‌ছি!

হেমা। তোমার আবার দিব্বি!

ফটিক। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এই দেখ্।

এই বলিয়াই ফটিক চাঁদ পকেট হইতে একখানা বহুকালের পুরাতন নিমন্ত্রণ কার্ড বাহির করিয়া দেখাইলেন।

"দেখি" বলিয়া কার্ডখানি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"এ ইণ্ডিল্ মিণ্ডিল্ কি বুঝ্‌বো; কি লিখেচে বাবু?"

হেমাঙ্গিনীর হস্ত হইতে কার্ড-খানি পুনঃ গ্রহণ করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"পাথুরিয়া ঘাটা লোকনাথ ঘোষের বাড়ী থিয়েটার, রাত্রি, ন'টার সময় নিমন্ত্রণ।"

বলা হইয়াছে কার্ডখানা বহুদিনের পুরাতন, ফটিক চাঁদ যাহা বুঝাইলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, সে কথা বলাই বাহুল্য।

হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"থিয়েটার, নিমন্ত্রণ; ক'টায় বোসবে?"

ফটিক। সাড়ে ন'টায়।

হেমা। তুমি একা যাবে, না ভূতেদের সঙ্গে নেবে?

ফটিক। নিমন্ত্রণ আমার, ওরা যাবে কেন?

হেমা। তা তারা পারে।

ফটিক। না—না তারা যাবে না, একাই আমি যাচ্চি, (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) চল্লুম্ মাই ডিয়ার !

হেমাঙ্গিনী ফটিক বাবুর চাদর ধরিয়া টানিয়া বলিল,—

"কখন্ ফির্‌বে বাবু ?"

ফটিক। বোধকরি দুটো বাজ্‌বে।

হেমার আহ্লাদ হইল, মনে মনে হাসিল, সে ভাব গোপন করিয়া বিমর্ষভাবে বলিল,—

"অত রাত হবে ? অত রাত পর্য্যন্ত আমি একলা কেমন কোরে থাকবো ! তুমি কাছে না থাকলে, আমার মনে কত রকম ভয় আসে, সদাই যেন গা ছম্‌ছম্ করে ; কে যেন এলো, কে যেন এলো, এই রকম যেন একটা ছায়া দেখি ! কিছুতেই ঘুম হয় না।"

ফটিক। আচ্ছা যত সকাল সকাল পারি চেষ্টা পাবো। চাদর ছাড়্।

যেন ফটিক চাঁদ ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, এইরূপ ভাণ করিয়া আদরের সুরে সোহাগ-ভরে হেমা বলিল,—

"একটু বোসো না বাবু !"

ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"আর বস্‌বার সময় নাই, রাত্রি সাড়ে আটটা।"

চাদরখানি ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় কপট সোহাগ করিয়া ফটিক চাঁদের দুই হাত ধরিয়া মায়াবিনী বলিল,—

"আমার মাথা খাও, বেশী রাত কোরো না, শীগ্‌গির এসো।"

বিংশ

হেমাঙ্গিনীর বাক্‌চাতুর্য্যে ফটিক চাঁদ এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার মোসাহেবেরা হেমার চরিত্রে যে দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইল, তাহাদের উপর বিলক্ষণ চটিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদের পরামর্শ মত না চলিলে পাছে তাহারা ক্ষেপিয়া যায়, সেই ভয়ে সাবধান হইয়া চলিবার সঙ্কল্প করিলেন।

কথায় কথায় নয়টা বাজিয়া গেল, মিনতি বচনে বিদায় লইয়া, ফটিক চাঁদ গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে লছমন আসিয়া বলিল,—

"বাবু, গাড়ী খাড়া হ্যায়।"

"হাম্ যাতা হ্যায়" বলিয়া, উপর হইতে নামিয়া আসিয়া, ফটিক চাঁদ গাড়ীতে উঠিলেন।

এদিকে হেমাঙ্গিনীর আর স্ফূর্ত্তি ধরে না। নিষ্কণ্টকে নেপালের সঙ্গে প্রেমামোদে বাসর জাগরণ হইবে, সেই আনন্দেই স্ফূর্ত্তি। স্ফূর্ত্তির পশ্চাতে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ; এখনও নেপালের দেখা নাই। অন্য দিন হইলে, এতক্ষণ নেপাল একবার চোখের দেখাও দেখিয়া যাইত: আজ কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত গর হাজির। এই আসে এই আসে ভাবিয়া হেমাঙ্গিনী পথ চাহিয়া আছে, প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল তথনও নেপালের দেখা নাই; রাত্রি দশটা বাজে, নেপাল তখনও অদৃশ্য। হেমার প্রাণ অস্থির হইল, ক্ষণে ক্ষণে ঘর বার করিতে লাগিল,—যেন সে পৃথিবীতে একা এইরূপ মনে হইতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী চিন্তা করিতে লাগিল,—

এখনও দেখা নাই! কাল আস্‌বো ব'লে সেই যে চলে গে'ছে,—আজ এখনও তার দেখা নাই! মা ব'লে, নেপাকে ঢুক্‌তে দিস্‌নি! নেপাকে না দেখে থাকি কেমন ক'রে? কিছু ভাল লাগে কি? কি করি, একটা গাই।"

হেমাঙ্গিনী প্রাণের আবেগে গাইতে লাগিল,—

কেন কেন কেন সখা কেন প্রেমেরি ছলনা।
পরাণে পিয়াস কই শুধু আঁখির আলাপনা।
কেন এত ভালবাসা উদাস প্রাণেরি আশা,
বাড়ায়ে প্রেম পিয়াসা, দিওনা আর যাতনা।
ভালবাস যদি সখা, দিও দিনান্তেও দেখা,
মিলায়ে প্রাণের খেলা, যুড়াব ক্ষণেক বেদনা।

গানে হিতে বিপরীত হইল; হেমাঙ্গিনীর প্রাণের জ্বালা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, কি করিবে কোথায় যাইয়া এ জ্বালা জুড়াইবে, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিল না। শেষে অনেক ভবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, এ জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায় তাহার মা। হেমাঙ্গিনী অস্থিরপদে তাহার মার ঘরে গেল, দেখিল, থাকমণি দুই পা ছড়াইয়া সলিতা পাকাইতেছে। হেমা একেবারে তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। থাকমণি চমকিয়া উঠিল, চমকিত কণ্ঠে বলিল,—

"কিরে হিমু! হোয়েছে কি? অমন কচ্ছিস্ কেন? জামাই এসেছিল না?"

মাথা হেঁট করিয়া হেমা বলিল,—

"এসে ছিল, নেমন্তন্নে গেছে।"

থাকমণি জিজ্ঞাসা করিল,—

"ফির্বে কখন্?"

হেমা বলিল,—

"বোলে গেল রাত দুটোয়।"

তলাইয়া না বুঝিয়া থাকমণি বলিল,—

"যা—শুগে যা।"

একটু যেন কাঁদ কাঁদ সুরে হেমা বলিল,—

"একলাটি চুপ কোরে শুয়ে থাকা—"

চতুরা থাকমণি তখন আসল কথা বুঝিল; গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বলিতে লাগিল,—

"দেখ্ হিমু, অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়; রোয়ে বোসে চার্দিক্ বজায় রেখে কাজ করাই ভাল! আমারও এক সময়ে বয়স ছিল, আজই না হয় বুড়ো হোয়েছি, আমিও তোর মতন বয়সে অমন ঢের লুকোচুরি খেলেছি, বাবুর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি,—উঠিয়েছি—বসিয়েছি,—তুই কি কোরেছিস্? আমার বুদ্ধির ধার দিয়েও ষেতে পারিস্নি, এত উতলা হোলে কি চলে?"

হেমার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেয়ের চোখে জল দেখিয়া, বুড়ী কাতর হইয়া বলিল,—

"এ বুড়ো মানসের কথা ত শুন্‌বিনি! যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্!"

মেয়েকে ঐ কথা বলিয়া, বুড়ী তখন চীৎকার করিয়া লছমনকে ডাকিল। লছমন আসিল বুড়ী তাহাকে বলিল,—

"যা বাছা নেপালকে একবার ডেকে আন্। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা হোয়ে গেল!"

লছমন নেপালকে ডাকিতে ছুটিল, আপন মনে আনন্দে বলিতে লাগিল,—

"আপ্‌নেসেআপ্ জালমে ফাঁস গিয়া। নেপাল বাবুকো ধরা দেনেসে দেবেন বাবুসে পচাশ পচাশ্ রূপেয়া মিলেগা। কাম্ কর্‌নেকো আস্তে লছমন্ হ্যায়, পয়সাকো আস্তে এক্ কৌড়িভি নেহি মিল্‌তা হ্যায়। বুড়িয়া বহুৎ বদ্‌মাস্ হ্যায়, দিন্ রাত কচ্ কচ্ লাগায়ে রহ্‌তি হ্যায়। ইয়ে কাম্ হাম্‌সে নেহি হোগা।"

দেবেনের কাছে টাকা খাইয়া, নেপালকে ধরাইয়া দিবার জন্য লছমন প্রতিশ্রুত হইয়া ছিল; এত রাত্রি পর্য্যন্ত নেপাল আসিল না, সেই জন্য লছমন চিন্তা করিতে ছিল। নেপালকে ডাকিবার হুকুম পাইয়া, তাহার বিলক্ষণ সুযোগ হইল; তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সে নেপালকে ডাকিতে ছুটিল।

লছমনকে অধিক দূর যাইতে হইল না; পথি-মধ্যেই নেপালকে দেখিতে পাইল। নেপাল হেমাঙ্গিনীর বাড়ীতেই আসিতে

ছিল। লছমন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। নেপাল আসিয়া হেমাঙ্গিনীর ঘরে বসিল, লছমন ওদিকে চুপি চুপি গিয়া দেবেনকে খবর দিল।

হেমার উপর লছমন সন্তুষ্ট ছিল না, থাকমণির উপরেও তাহার কোপ ছিল। থাকমণি সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ বিড়্ বিড়্ করিত, যখন তখন গালি মন্দ দিত, সেই জন্য কোপ। হেমাঙ্গিনীও বক্‌সিসের লোভ দেখাইয়া লছমনের দ্বারা কাজ উদ্ধার করিয়া লইত, একটি পয়সাও দিত না, সেই জন্যই হেমার উপর লছমনের রাগ।

নেপালকে দেখিয়াই হেমাঙ্গিনী মান-ভরে যৎপরোনাস্তি গালাগালি বর্ষণ করিল, মার্জ্জনী প্রহার করিল; তাহার পর প্রেম সোহাগে আদর সোহাগ।

সোহাগে সোহাগে হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"তোর বড্ড তেজ হয়েছে।"

নেপাল। তা হবে না কেন?

হেমা। বটে রে মুখ পোড়া তবে দেখ্‌বি?

নেপাল। (যোড় হস্তে) না বাবা আর দেখিয়ে কাজ নেই। এই দেখ্ পিঠ একেবারে দড়া দড়া হোয়ে গেছে!

হেমা। তবে হার মান্‌লি বল্?

নেপাল। এজ্ঞে এ কথা মেন্থি করি!

হেমা। এত দেরি?

নেপাল। ওশালা এখন নাই কি জানি ?

হেমা। একবার দেখা দিয়ে গেলে কি হোতো পোড়ার মুখো ?

নেপাল। আজ একটু কাজ ছিলো।

হেমা। কাজের ত ফাটাফাটি। নে এক গেলাস খা।

নেপাল। পেসাদ কোরে দে ?

উভয়ে মদ্য পানান্তে হারমোনিয়মের সুরে গান ধরিল,—

হেমা— গীত।

ভালবাসি ব'লে ভাল বাসিস্ নে।
(পোড়া) পীরিতির রীতি নীতি তুই জানিস্ নে॥
সযতনে হাতে ক'রে, দিছি প্রাণ তোরি-করে,
অনিশ্চিতে আশা ক'রে নিশ্চিতে ত্যেজিস্ নে॥

নেপাল—

জানি জানি ভাল জানি, তোর পীরিতের টান কতখানি,
ডুনায়ে পা দিয়ে ধনি, গুরু-গিরি করিস্ নে॥

উভয়ের প্রেমালাপ চলিতেছে, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ হইল। নেপাল চমকিয়া উঠিল, চুপি চুপি বলিল,—

"ঐ কে আস্‌চে !"

জুতার শব্দ পাইয়া হেমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল, আসিয়াই দেখিল, সম্মুখে ফটিক চাঁদ। হেমার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, "মা—মা" বলিয়া দুইবার ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—

"চোর—চোর—চোর !

কাণ্ডখানা কি. হেমার মা সব বুঝিল ; ছুটিয়া আসিয়া অমোঘ অস্ত্র ছাড়িল ; বলিতে লাগিল,—

"পোড়ারমুখীকে, রোজ রোজ সাবধান হোয়ে শুতে বলি, তা হারামজাদী, কিছুতেই শুন্‌বে না। আমি বাঁদী, আমার কথা শুন্‌বে কেন ? হারামজাদীকে ঝেঁটিয়ে বিষ ছেড়ে দিলে, তবে রাগ যায়। এমন রাজা জামাই কার ভাগ্যে ঘটে ? অনেক পুণ্য-বল, তাই এমন জামাই পেয়েছি। কত বড় বড় জায়গা থেকে বাবার আমার নেমন্তন্ন আসে, তা বাবা কি তোর জ্বালায় কোথাও নেমন্তন্নও রাখ্‌তে যাবে না ? এওযে তোর ভারি অন্যায় আব্দার। তা বাবা একদিন নেমন্তন্নয় গেল, দরজাটায় না হয় খিল দিয়ে শো, তা নয় ; সাবধান হোয়ে শুলে কোন ভয় থাকে না। পোড়ারমুখী তা কোর্‌বে না, ঘর আর বার। আজ কাল চোর দরজায় দরজায় ফির্‌চে, একটু ফাঁক পেলে হয়। আর লছমনেরই বা দোষ কি ? সে তো আর দিনরাত ঘরে বোসে থাকে না—এটা ওটা কেনা আছে, ফাই ফরমাস্‌ শোনা আছে, থির হোয়ে কি এক জায়গায় বোসে থাক্‌তে পারে ? এই পরশু কলতলা থেকে খামকা একটা ঘটী চুরি কোরে নিয়ে গেল ; যেই ঘটিটী রেখে পেছন ফিরেচি,—ফিরে দেখি আর নেই ! ঐ বেটাই হয়ত সেই চোর।"

এই বলিয়া বুড়ী অনবরত গালি পাড়িতে লাগিল।

নেপাল একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, মনে মনে ভাবিল,—

"বেশ্যারা নিমকহারাম জাতই বটে। হেমা সর্ব্বদাই বলে, ধরাপোড়্‌লে সে ফটিক চাঁদকে ছেড়ে দেবে। আজ ঠিক বিপরীত ঘোট্‌লো! আমিই চোর হোয়ে ধরা পোড়লুম্! আমাকে মেরে ফেল্‌লেও একটা কথা বল্‌বার লোক নাই! শেষে আমার এই দুর্দশা হোলো! আমিই মারা পড়্‌লুম্! উচিত শিক্ষাই পেলুম্!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নেপালের দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। ফটিক চাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নেপালের সম্মুখীন হইলেন, পায়ের জুতা খুলিয়া নেপালকে বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। নেপাল পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া ফটিক চাঁদের হাতে পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন ফল হইল না; উন্মত্ত প্রায় ফটিক চাঁদ নিরস্ত হইলেন না।

সেই সময়ে হেমার মা বলিয়া উঠিল,—

"ঐ বেটাই আমার ঘটী চুরি করেছে! নতুন ঘটী গো, নতুন ঘটী!"

সুরে সুর মিলাইয়া হেমা বলিল,—

"মা! তুই ঠিক্ বলেছিস্। এই বেটাই ঘটী চোর! ভাগ্যি আমি ঘরে এসে পোড়েছিলুম্, তাই রক্ষে, তা না হোলে সব্বস্ব চুরি কোরে নিয়ে পালাত!"

মায়ের বাক্যে এইরূপে সায় দিয়া, ফটিক চাঁদকে সম্বোধন করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"বাবু গো! ওটা চোর! ওটাকে মেরে আধ মারা কোরে, পুলিসে ধরিয়ে দাও! তা না হোলে একদিন সর্ব্বস্ব চুরি কোরে নিয়ে যাবে!"

মাতা-পুত্রীর ঐ সকল কথা ফটিক চাঁদের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না জানি না। ফটিক চাঁদ ক্রোধে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। তিনি নেপালকে বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। নেপালের কাকুতি-মিনতি কান্না কাটিতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

প্রহার চলিতেছে এমত সময় দেবেন, সাতকড়ি ও ভূতনাথ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল! দেবেনের বিভীষণ মূর্ত্তি দর্শন মাত্র নেপালের প্রাণ উড়িয়া গেল। দেবেনের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে অতি করুণ স্বরে বলিতে লাগিল,—

দেবেন বাবু! দেবেন বাবু!!—দোহাই আপনার পায়ে পড়ি,—আমি অতি গরীব,—গরীবকে হত্যা করবেন না!—আমি আপনার সন্তান,—আপনি আমার বাপ,—বাবা একটু জল,—একটু জল!"

নেপালকে দেবেন অল্প অল্প চিনিত। নেপালের হৃদয় বিদারক কথা শুনিয়া তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, বলিল,—

"ভয় কি?"

নেপালকে অভয় দিয়া দেবেন তখন ফটিক চাঁদের দুই হাত ধরিয়া বলিল,—

"করেন কি? করেন কি?"

দেবেনের হস্তে ফটিক চাঁদের হস্ত আবদ্ধ, ইত্যবসরে নেপাল দেবেনের পদতল হইতে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল। "ধর ধর্" বলিয়া সাতকড়ি ও ভূতনাথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

সদর দরজায় লছমন আছে, পাছে সে ধরে, সেই ভয়ে নেপাল সে দিকে না গিয়া পিছনের দ্বার দিয়া পলায়ন করিল, সেই সঙ্গে হেমাঙ্গিনীও পলাইল। থাকমণি অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

সাতকড়ি ও ভূতনাথ অন্ধকারে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া আসামীকে ধরিতে না পারিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল।

ফটিক চাঁদের ইচ্ছা ছিল, নেপালকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু অবসর হইল না, নেপাল পলায়ন করিল।

নেপাল ধরা পড়িল না শুনিয়া ফটিক চাঁদ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন, বলিলেন, "যত সব কানা খোঁড়ার ডিম, কোন কাজেরই নয়!" দেবেনকে তিনি অনেক ভৎসনা করিলেন, তাহার পর হেমাঙ্গিনীর খোঁজ পড়িল। "হেমা হেমা" বলিয়া বার কতক তিনি চীৎকার করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না, হেমাঙ্গিনী আসিল না। ফটিক চাঁদ তখন থাকমণিকে ডাকিলেন। একটু পরেই থাকমণি আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল।

ফটিক চাঁদ রাগিয়া ছিলেন, বুড়ীকে দেখিয়া রাগ আরও বাড়িল; কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়া তিনি বলিলেন,—

"তোর মেয়েটা গেল কোথা, এখনই হাজির কর্, তা না হোলে তোদের পক্ষে ভাল হবে না!"

থাকমণি সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল; চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল,—

"মাগো! চোক দুটো কোরে এসেছে দেখ! যেন আমি গেরস্থর বৌ ঝি বার কোরেছি। তোর মেয়ে মানুষকে তুই বুঝগে যা, মার্‌তে হয় মার্‌বি, কাট্‌তে হয় কাট্‌বি, রাখ্‌তে হয় রাখ্‌বি, আমার উপর চোক রাঙালে কি হবে? আমি কারও চোক রাঙানির ধার ধারিনি! কোরে এসেছে দেখ! যেন মার্‌তে উঠেছে! মার্ না দেখি! একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্ না দেখি,—কেমন মজা! মেয়ে-মান্‌ষের গায়ে হাত তোলা অম্‌নি নয়, বুঝে সুঝে কাজ কর্‌তে হয়,—একেবারে জিঞ্জির পাঠাবো! মনে করেচে আমাকে শাসিয়ে রাখ্‌বে! ওঃ! আমি ভয়ে কাঁজি হাঁড়ীর ভেতর লুকিয়ে থাক্‌বো! কচি খুকী কি না আমি! হেমাত আমার পেটের মেয়ে নয়, আর তোর বিয়ে-করা মাগও নয় যে, কোলে কোরে বোসে থাক্‌বো, কি কচ্চে না কচ্চে, রাতদিন চোক রাখ্‌বো! অত যদি টান, তবে নিজের কাঁচায় বেঁধে রাখ্‌তে হয়। আমায় শাসাচ্চিস্ কি? আমি কারও ধার কোরেও

খাইনি, এক পাঁচিলে বাসও করিনি; তোর জিনিষ, তুই বুঝগে যা, আমার তাতে কি?"

বুড়ীর অত কথাতেও ফটিক চাঁদ দ্বিরুক্তি করিলেন না। গলার স্বর একটু নরম করিয়া বুড়ী আবার বলিতে লাগিল,—

"মেয়েটা এপথে এসেচে সত্যি, তা তোমাকে দেখে ত আর আসেনি, আর কুলের বৌও নয় যে, একজনকে নিয়ে থাক্‌বে। ওর সাত পুরুষ এই কাজ করচে, ওর সঙ্গে ধরা কি! বেঙাচির আশায় ত কেউ পুকুর পিতিষ্ঠে করে না! তেমন তেমন বাবু জোটে, দু পয়সা কোরে নেয়, তেতলায় ওঠে; আর তেমন বরাত যদি না হয়, খোলার ঘর মাঠ-কোঠা আছে। দেখে দেখে আমার এত বয়স হোলো, চুল পাক্‌লো, তোমরা কি তা বোঝ? তোমরা দেখেও দেখ না, বুঝেও বোঝো না। আর,—"

বুড়ো ময়নার কথা শুনিয়া ফটিক চাঁদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

"আজ এই কথা! ঐ মুখেই না এক সময়ে হেমাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেছেলে, আর হেমার মত সতী সাধ্বী আর নাই বলিয়া কত বড়াই কোরেছেলে?"

বুড়ী আবার চোখ মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"তুমি যেমন ন্যাকা, তেমন ন্যাকাত আর নেই! তুমি আমার কথায় বিশ্বেস কোরে নিশ্চিন্দি হোয়ে ছেলে! হায়

আমার কপাল! আমাদের কাজই এই ;—যখন যার, তখন তার! দুটো টাকা বা দুমুঠো ভাত পেলেই সন্তুষ্ট! আমাদের অদেষ্টের ভোগ, দু-জনকার মন যোগাতে যোগাতে পরাণ বেরিয়ে যায়! ছুক্‌রীর মনের মতন না হোলে পায়ে ধোরে কান্না-কাটি করে, আর বাবুর মনের মতন হোতে গেলে এক জনের অন্ন যায়, তাই দুদিক বজায় রেখে চোল্‌তে হয়! আমাদের কি কম দুর্গ্যতি, এতে আমাদের কি দোষ বল?"

ফটিক চাঁদ আর কোন কথা বলিলেন না। বেশ্যা জাতের উপর তাঁহার ভয়ানক ঘৃণা জন্মিল, হেমার মার সহিত কথা কহিতেও তাঁহার ঘৃণা আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে বাহির হইলেন। মোসাহেবেরাও সেই সঙ্গে বাহির হইল।

একবিংশ উল্লাস।

"যেমন কুকুর।
তেমনি মুগুর॥"

দল বল সহ বাবু বাহির হইয়া গেলেন, হেমাঙ্গিনীও ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নেপাল ধরা পড়িবার পর অবধি ফটিক চাঁদ আর হেমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। দুই মাস অতীত। হেমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে তিনি ঘৃণা বোধ করেন, অপরের মুখেও হেমার নাম শুনিলে জ্বলিয়া যান। হেমা কতবার পত্র লিখিল, সাক্ষাৎ করিবার জন্য কতবার তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটিল, কিছুই ফল হইল না; সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক পত্রগুলা হাতে পড়িলেই ফটিক চাঁদ সেগুলা দূর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। বেশ্যার প্রতি তাঁহার প্রাণ একেবারে চটিয়া গিয়াছিল।

হেমা অনেক কান্নাকাটি করিল, কয়দিন এক প্রকার উপবাসে রহিল, রাত্রে ঘুমাইল না, বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল; নেপাল নিকটে আসিলে গালাগালি দিয়া মার্জ্জনী প্রহার করিয়া

পিঠের চামড়া তুলিতে লাগিল। তাহার পর যখন দেখিল যে, ফটিক চাঁদ আর আসিলেন না, তাহাকে সত্য সত্যই ত্যাগ করিলেন, তখন চোখের জল মুছিল, পেট ভরিয়া খাইতে লাগিল, পূর্ব্বের ঘুম আবার প্রবল বেগে আসিয়া তাহার নয়ন আশ্রয় করিল। হেমা ভাবিল, তাহাকে ত আবার পথ দেখিতে হইবে? এখন তাহার বয়স কাঁচা, এ কাঁচা বয়সে অন্য লোক-জন না করিয়াই বা থাকে কি বলিয়া? হেমা ফটিক চাঁদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি করিয়াছে, বাটী ভাড়াতে টাকার সুদে, মাসিক চারি শত টাকার অধিক আয় করিয়াছে, সে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারে সত্য, কিন্তু রোজগার করিবার বয়স থাকিতে ঘরের টাকা খরচ করিয়া, বসিয়া বসিয়া খাইয়া কি ফল? হেমা অবুঝ নয়, বিশেষ মাথার উপর তাহার মা আছে, সেই বা তাহাকে ঘরের টাকা ভাঙ্গিয়া খাইতে দিবে কেন? উঠিতে বসিতে গালি দিয়া ভূত ছাড়াইবে; হেমার সে ভয়ও ছিল, সুতরাং সে রোজগারের পথ দেখিতে বাধ্য হইল। হেমা আবার সাজ-সজ্জা করিয়া বাহার দিয়া; বারান্দায় দাঁড়াইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় একখানি ল্যাণ্ডো হেমার দরজায় লাগিল। একজন ফিট্ বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। বাবুর বয়স ত্রিশের মধ্যে, চেহারা সুন্দর নয়, কিন্তু পোষাক অতি সুন্দর, গাড়ি, ঘোড়া, সহিস, ক্যোচ্ম্যান সকলই সুন্দর, সকলই ফিট্ফাট্।

বাবু বুক ফুলাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, মশ্ মশ্ করিয়া একেবারে উপরে উঠিয়া গেল। বাবু যে ভাবে সোপানা-বলী অতিক্রম করিল, তাহাতে বোধ হইল সে বাড়ীখানা তাহার বহুদিনের পরিচিত। বোধ হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেমার বাড়ীতে সে বাবুর এই প্রথম পদার্পণ।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, বারান্দা পার হইয়া বাবু একেবারে হেমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। কার্পেটের বিছানার উপর জুতা সুদ্ধ উঠিল, তাকিয়া ঠেস দিয়া আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। হেমা এক গাল হাসি হাসিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, নূতন বাবুর গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

হেমার আজ স্ফূর্ত্তির উপর স্ফূর্ত্তি। হেমা আজ সহস্র মুখ ধারণ করিয়াছে। সহস্র মুখে সহস্র কথা নির্গত হইতেছে। কে বলে হেমার এখন স্ফূর্ত্তি নাই? কে বলে হেমা এখন হাস্য পরিহাস ভুলিয়া গিয়াছে? আজ যদি ফটিক বাবু সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন, হেমা একটী সুমধুর প্রেম-রসের নবীনা-নির্ঝরিণী, হেমার মুখ হইতে সহস্রধারে প্রেম-রসের সহস্রধারা গড়াইয়া পড়িতেছে; সে রসের আস্বাদন যিনি একবার পাইবেন, তিনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না,—অহর্নিশ পান করিতে ইচ্ছা হইবে। স্বর্গে অপ্সরা আছে, মর্ত্তলোকে এই হেমাঙ্গিনী একটী শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। নৃত্য গীতে দেবতার মন কাড়িয়া লইতে, যোগীর যোগভঙ্গ করিতে, হেমাকে দেখা যায় নাই

বটে, কিন্তু আজিকার হেমার হাব-ভাব, চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা ও স্ফূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, হেমা, দেবরাজ ইন্দ্রের মন হরণ করিতে ও মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ করিতেও পূর্ণ ক্ষমতা ধারণ করে।

নূতন বাবু হেমাঙ্গিনীর মুখনিঃস্বৃত মধুর মধুর ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণ করিতেছে, অল্প অল্প হাসিতেছে, একটীও কথা কহিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দশটা বাজিল। থাকমণি থপ্ থপ্ করিয়া হেমার ঘরে প্রবেশ করিল, হেমাকে লক্ষ্য করিয়া, ভর্ৎসনাচ্ছলে বলিল,—

"তোর আক্কেলকে গড় করি! বলিহারি যাই! জামাই বাবু সন্ধ্যে থেকে ঠায় বোসে আছে, একটিবার একটু জল খেতেও বল্লি নি, রাত্তির যে এদিকে এগারটা বাজে! যা ওরা খান, তাও আনিয়ে দিলিনি, তোর আক্কেল কি? বাড়ীতে থাক্‌লে এতক্ষণ তিনবার খাওয়া হোয়ে যেতো।"

এইরূপ মেয়েকে ভর্ৎসনা করিয়া, তাহার পর একটু আদর জানাইয়া, বুড়ী শেষকালে বলিতে লাগিল,—

"ডাক্ বেহারীকে ডাক্, গণ্‌শার হোটেল থেকে আন্‌তে দে। বোলে দিস্, যেন ভাল দেখে নিয়ে আসে, বাসী জিনিষ গুলো যেন নিয়ে আসে না। গণশা বেটা আমাদের যেন পাকা কলা পায়, যত বাসী, পচা, গুঁচা, শেষ কুড়ন্তে, হাড় চামড়া গুলো ওজন করে দেয়! দাম নেয় দুগুণ, তিনগুণ, চারগুণ! বেহারীকে ভাল কোরে বোলে দিস্, সে রকমে যেন ঠকায় না।"

মেয়েকে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকমণি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। হেমা তখন বেহারীকে ডাকিয়া একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিল; যাহা যাহা আনিতে হইবে, এক এক করিয়া তাহাও বলিয়া দিল।

নোটখানা লইয়া বেহারী বেহারা হোটেলে ছুটিল; অভ্যাস মত দস্তুরি কাটিয়া লইয়া ফরমাস্ মত জিনিষ আনিয়া হাজির করিল; প্রধান জিনিষ লাল কাগজ মোড়া দুই বোতল হুইস্কি।

পাঠক, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ বেহারী বেহারা কে? লছমন কোথায় গেল? লছমন চাকরি ত্যাগ করিয়াছে। ফটিক চাঁদ থাকিতে লছমনের দুপয়সা লভ্য ছিল, এ কারণে সে হেমা ও হেমার মার গালাগালি সহ্য করিত। ফটিক চাঁদের অভাবে লছমনের সে রোজগারটা বন্ধ হইয়াছিল, কাজে কাজেই সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পদে বেহারী বেহারা নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে।

পান ভোজনের উপকরণ আসিল, হেমাঙ্গিনী স্বহস্তে পরিবেষণ করিল, দুইজনে হাস্য কৌতুকে বোতল গ্লাসের ও শানক চামচের যথোচিত মান রক্ষা করিল।

জিনিষ গুলির একটি তালিকা দেওয়া দরকার। কেলনারের গ্রীনশীল মার্কা হুইস্কি,—গণশার হোটেলের মটন-কারি, মটন-কাটলেট, মটন-চপ, কোপ্তা, কারি, মালাই-কারি, কোরমা হাঁসের ডিমের মামলেট্, মুরগীর ডিমের মামলেট্, পানত্রাস, মারিনা, টীপ্‌সি পুটীন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘন ঘন মদ্যপান চলিল, হোটেল ভোগ চলিল, একঘণ্টা ধরিয়া এত কাণ্ড হইল, নূতন বাবু একটিও কথা কহিল না।

হেমার দরজায় নূতন গাড়ী ও নূতন বাবু দেখিয়া, হেমার পরিচিতা দুই চারিটী প্রতিবেশিনী সঙ্গিনী সেই মজলিসে হাজির হইয়াছিল। তাহারা নূতন বাবুর নূতন ধরণ দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। হেমাও বিলক্ষণ অপ্রস্তুত। বাবু যদি ল্যাণ্ডো না চাপিয়া, হাঁটিয়া আসিত, তাহা হইলে হেমা, আজ তাহার মাথায় হুঁকার জল দিয়া শতমুখী প্রহার করিয়া, বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিত; মনে খট্‌কা লাগিলেও, ল্যাণ্ডোওয়ালা বাবু, অবশ্য বেশী টাকা দিবে, সেই লোভে হেমা সেই বাবুর অসভ্যতা সহ্য করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল,—

"ভূষ্‌ণোর বাঙাল, ধরা পড়্‌বার ভয়েই বাগ্‌রোধ। তা হোক্ লোকটা বাঙাল হোক্ টাকা ত আর বাঙ্গাল নয়! এটাকে ফাঁদে ফেলে দু দশ খানা বাড়ী কিনে, দু চার লাক্ আদায় কোরে, তারপর কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়াবো। আমাদের এই রকম বোকা লোকই দরকার, চালাক চতুর দরকার নেই,—আজ আছে, কাল নেই। হ্যাপা আমার বেঁচে থাক্!"

হেমা এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে থাকমণি আসিয়া ক্রোধ ব্যঞ্জক-স্বরে হেমাকে বলিতে লাগিল,—

"তুই কেমন ধারা মেয়ে গা! তোকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আর পার্‌লুম না! জামাই আজ নতুন এসেচে, সারারাত কি জাগাতে

হয় ? খাওয়া দাওয়া যদি হোয়ে গিয়ে থাকে, মজলিস্ ভেঙ্গে দে। রাত যে এদিকে ফরসা হোয়ে এল ; দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ কর্, একটু ঘুমো ; সারারাত জাগ্‌লে বাবুর অসুখ হবে।"

হেমাকে ঐ সব কথা বলিয়া, বুড়ী তৎপরে বাবুকে বলিতে লাগিল,—

"বাবা, রাত অনেক হোয়েচে একটু আরাম কর। এ তোমারই ঘব, তোমারই বাড়ী, তুমি স্বচ্ছন্দে আরাম বিরাম কর।"

বাহির হইয়া যাইবার সময় বুড়ী আবার হেমাকে বলিয়া গেল,—

"রাত্তির ঢের হয়েচে এখন তোরা শো।"

বুড়ী চলিয়া গেল। নূতন বাবুর রকম সকম দেখিয়া, হেমার সঙ্গিনীরা হাসিতে হাসিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

হেমাঙ্গিনী ভাবিল,—

"বাবুটী হয়ত বোবা, কালা, কথা কহিবার শক্তি নাই।"

হেমা যা হয় ভাবুক, আমরা কিন্তু বুঝিতেছি, বোবা কালা নয়, বোকাও নয়, পেটে পেটে বুদ্ধি। মদ খাইবার সময়, তুখোড় ইয়ার লোকেরা দুষ্টবুদ্ধির সংযোগে যেমন মুখের কাছে রুমাল ধরিয়া, সেই রুমালে গেলাস উজাড় করে, কেবল একটু একটু মুখে দেয়, এ লোকটিও ঠিক তাই করিয়াছে ; বেশী মদ খায় নাই, সুতরাং মাতাল হয় নাই। প্রায় শেষ রাত্রে তাহারা শয়ন করিল ; সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিল। বাবুর বিদায় হইবার উপক্রম। জমকালো গাড়ী-চড়া

জমকালো পোষাক-পরা, নূতন বাবুর কাছে হেমাঙ্গিনী অতি কম হাজার টাকা মারিয়া লইবার আশা করিয়াছিল, সে আশা ভাসিয়া গেল, একটি পয়সাও আদায় হইল না।

বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় পূর্ব্ব দিনের ল্যাণ্ডো আসিয়া হেমাঙ্গিনীর দ্বারদেশে দাঁড়াইল। নূতন বাবুকে দেখিবার জন্য, আশে পাশের বার-বিলাসিনীর দল, বারান্দায় আসিয়া জুটিল, কাহারও কাহারও যুগল-মূর্ত্তি। একটু পরেই নূতন বাবু মুখ মুছিতে মুছিতে বাটীর বাহির হইল। সম্মুখেই গাড়ী। গাড়ীতে না উঠিয়া বাবু রাস্তার অন্য ধারে চলিল। দুইদিকে দুইখানা বাড়ী, মধ্যস্থলে একটা পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা। বাবু সেই নর্দ্দমার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, সেই খানে একখানা ছেঁড়া টেক্‌নি পরিয়া অঙ্গের পোষাকগুলি হাতে করিয়া, আবার সেই গাড়ির কাছে আসিল; পোষাকগুলি গাড়ির উপর রাখিয়া, আবার সেই নর্দ্দমার ধারে গেল; তথা হইতে বাঁকে করিয়া দুইটা বিষ্ঠার বাল্‌তি স্কন্ধে লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য; হেমার বাড়ীর পাশের সমস্ত বাড়ীর বারান্দাগুলিও লোকারণ্য। কানাকানি, বলাবলি, ক্রমে হাঁকাহাঁকিতে আসল ব্যাপারটা সকলই জানিতে পারিল। যাবতীয় লোক হাততালি দিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী তখন জানিতে পারিল, গত রাত্রে তাহার ঘরে মেথর আসিয়াছিল, যে লোকটা পোষাক পরিয়া বাবু সাজিয়া

ল্যাণ্ডো হইতে নামিয়া ছিল, বাস্তবিক সে লোক একটা মেথর। মেথরের সংস্রবে হেমার জাতি গেল, লাভের আশাতেও ছাই পড়িল। মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া মেথর-বিলাসিনী হেমাঙ্গিনী ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিল, থাকমণিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

এইখানে রহস্য ভেদ! নটের গুরু মোসাহেব-মণ্ডিত ফটিক চাঁদ, হেমাঙ্গিনীর প্রেমের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত ঐ মেথরকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া, বাবু সাজাইয়া ল্যাণ্ডো চড়াইয়া, হেমার বাড়ী পাঠাইয়া ছিলেন। মেথর সেই উপদেশ মতে ঠিক ঠিক অভিনয় করিয়া ছিল। হেমাঙ্গিনীর দর্প একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল! লোকালয়ে তাহার আর মুখ দেখাইবার পথ রহিল না।

তাহারা মায়ে ঝিয়ে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল,—ঘরের বাহির হইত না,—মায়ে ঝিয়ের পোড়া মুখ মায়ে ঝিয়েই দেখিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ উল্লাস।

"যার কাজ তারে সাজে।
অন্য লোকের লাঠি বাজে॥"

দুই বৎসর অতীত। যে ফটিক চাঁদ হেমাঙ্গিনীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, যে ফটিক চাঁদ মদিরা-গণিকা-কুহকে উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন, সেই ফটিক চাঁদ এখন ফটিক-মণির ন্যায় স্বচ্ছ; আচারে শুদ্ধ-সিদ্ধগঙ্গাজল। হেমাঙ্গিনী বিসর্জ্জন;—কেবল হেমাঙ্গিনী কেন, যাবতীয় কুক্রিয়া বিসর্জ্জন। ফটিক চাঁদ এখন মদ ও বেশ্যার নামে হাড়ে হাড়ে চটা। সংসারের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন; কিন্তু এখন সে উদাসীনতা নাই। তিনি এখন সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়াছেন, সকল প্রকার কু-সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, সূর্য্যদেবের অস্তগমনের পর, তিনি আর বাটীর চৌকাটের বাহিরে পদার্পণ করেন না। সংসার-ধর্ম্মে তাঁহার মতি হইয়াছে, বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কি একটী কার্য্য অঙ্গহীন আছে ভাবিয়া এখনও তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। হিমালয়ে গৌরীর সহিত শিবের মিলনের পর, নন্দী ভৃঙ্গী যেমন ভূতের নৃত্য

পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছিল, ফটিক চাঁদের বিবাহের অগ্রেই মোসাহেবেরাও ভঙ্গিক্রিয়া ত্যাগ করিয়া সেইরূপ শিষ্ট শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, ভূতনাথ ও সাতকড়ি, এই তিন জন এখন ঠিক সামাজিক ভদ্রলোক। কাবুলি হেঙ্গামার পর অবধি ফটিক চাঁদ বিরক্ত হইয়া মটুক চাঁদকে দিনকতক নিকটে ঘেসিতে দেন নাই, তাহার পর মটুক তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া, বাবুর অনুগ্রহভাজন হইয়াছে; মটুক এখন বেশ ভাল মানুষ হইয়া বাবুর আনুগত্য করিতেছে।

এই ভাবে আরও ছয় মাস অতীত হইল। ফটিক চাঁদ এই সময় তাঁহার ঐ পারিষদ চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাত্রা করিলেন। এক মাস বৃন্দাবন বাস। কুঞ্জ দর্শন, বিগ্রহ দর্শন, বন পরিভ্রমণ, গিরি গোবর্দ্ধন দর্শন ইত্যাদি তীর্থ কার্য্যে দিন গত হইতে লাগিল।

ফটিকের পারিষদেরা এক দিন অপরাহ্ণে যমুনা তীরে পরিভ্রমণ করিতেছে, হঠাৎ অদূরস্থ এক বৃক্ষতলে এক বৈষ্ণব ও একটী বৈষ্ণবী তাহাদের নয়নগোচর হইল; বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সেই সময় পরস্পর যেরূপ কথোপকথন করিতে ছিল, তাহাও তাহাদের শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিল। কথোপকথনের তাৎপর্য্য এইরূপ,—

বৈষ্ণব। শেষে আমাদের কপালে এই ছিল বোষ্টুমী! বাট্-পাড়ে সব্ নিলে বোষ্টুমী! আর কতকাল ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে কোরে ঘূরে ঘূরে বেড়াব বোষ্টুমী!

বৈষ্ণবী। এ দশা হবে না তো কি হবে! মা এতদিন এতটা কোল্লে, সে মাকে মর মর ফেলে, সব নিয়ে আমরা পালিয়ে এলুম, সে পাপের ফল কি ভুগ্‌তে হবে না! সর্ব্বস্ব গেল! পথের মাঝখানে ডাকাতে সব লুটে নিলে! চোরের ধন বাটপাড়ে খেলে! শেষে আমার টুকনি সার! আর ভাব্‌লে কি হবে! যা করেন গৌরাঙ্গ!

বৈষ্ণব। রেখে দে তোর গৌরাঙ্গ! তার সম্বল ঝুলি কাঁথা, আমাদেরও—

বৈষ্ণবী। (সম্মুখে চাহিয়া) ঐ একদল যাত্রী আস্‌চে, আয়, একটা গান ধরি আয়।

বৈষ্ণব। তুই আগে ধর্‌, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে সুর ধোরে যাবো।

খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণবী গীত ধরিল, করতালি দিয়া বৈষ্ণব তাহার দোহারকি করিতে লাগিল।

গীত।

(ওলো নাগরি!) গৌর কল্লেন্ কি শোন্‌লো নাগরি!
ঘরেতে মন থাকে না, প্রাণ থাকে না,
গৌর হেরে মান থাকে না,—কি করি।
(আমি) গৃহ কাজে থাকি ভুলে,
ও চাঁদ গৌর এসে, কাছে বসে, আমারে বলে,—

(কানে কানে আমারে বলে)

চল বিরলে আনন্দ করি ;—

(আবার) চল ধনি ! ও রঙ্গিণি ! প্রেম রঙ্গে দি গড়াগড়ি ।

মনে করি হের্‌বো না তায়,

ও চাঁদ গৌর এসে, কাছে বসে, আমারে জাগায়,—

বলে উঠ ধনি ! ও রঙ্গিণি ! অঙ্গে অঙ্গ সম্বরি ।

গীতের শেষ কলি সমাপ্ত করিয়া গায়ক গায়িকা যখন পাল্টা ধরিবার উপক্রম করিল, সেই সময়ে যাত্রার দল, তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, গাছের আড়ালে দাড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল ।

যাত্রীর দলে কে কে ?—ফটিক বাবুর চারিজন মোসাহেব,—দেবেন্দ্রনাথ, ভূতনাথ, সাতকড়ি ও মটুক চাঁদ ।

সাতকড়ির কানে কানে মটুক বলিল,—বষ্টুমীটে মন্দ নয় !

সাতকড়ি । (জনান্তিকে) গলার স্বরও বেশ মিঠে !

ভূতনাথ । (জনান্তিকে) এ অল্প বয়সে প্রেম-উদাসী, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি । চল্‌, আরো একটু এগিয়ে যাই ।

মটুক । (একটু চিন্তা করিয়া জনান্তিকে) চিন্তে পেরেছিস্‌ ? আমার যেন মনে হয়, চিনি চিনি ।

বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, তাহারা আরও একটু অগ্রসর হইল । মটুক পুনর্ব্বার বলিল,—

"ঠিক্‌ ! ঠিক্‌ ! ঠিক্‌ ! তাই বটে ! চিনেছি ! চিনেছি !"

মটুকের কথা বৈষ্ণবীর কানে গেল; গীতের পাল্টা ধরিবার সুর ছাড়িয়া দিয়া বৈষ্ণবের কানে কানে সে বলিল,—

"পালাই চল্! পালাই চল্!

বৈষ্ণব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ঘাড় মাথা নাড়িয়া, একমনে করতালি দিতেছিল, যাত্রীদল তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই; বৈষ্ণবীর মুখে পলায়নের কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠিয়া সে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

পশ্চাতে ফেউ ডাকিলে, বাঘ যেমন ছুটিয়া পলায়, ত্রস্তপদে উঠিয়া বৃক্ষতলের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীও সেইরূপে ছুটিয়া পলাইল।

দেবেন বলিল,—

"ওহে মটুক! আমিও এইবার চিনেছি! ঠিক্ বোলেছো! ঠিক্ চিনেছো!"

মটুক। কারা বল্ দেখি?

দেবেন। ঐ বোষ্টুমীটে আমাদের সেই হেমবরণী হেনা; আর বোষ্টমটা তার সেই গুপ্ত নাগর নেপা।

মটুক। (হাস্য করিয়া) ঠিক্ বোলেছো! একবার দেখেই আমি চিনে ফেলেছি।

দেবেন। (বুক ঠুকিয়া শ্লাঘা করিয়া)

দেবার কথাই ফলেছে,
টুক্নি হাতে মানিয়েছে।

ভূতনাথ। (কোমর দোলাইয়া সুর করিয়া)

নাগর মনের মত মিলেছে ভাল!

হেমা-নেপা ভেক নিয়েচে, শ্রীবৃন্দাবন আলো!

ভূতনাথের গীতের ছটায় সকলে এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া ছিল, এই সময় যাত্রীরা ঐ প্রসঙ্গে নানা কথা কহিতে কহিতে কুঞ্জের বাসায় ফিরিয়া গেল।

ফটিক চাঁদের সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেবেন্দ্র বলিল,—

"বাবু ভারি মজা হোয়েছে! আজ সেই হেমাঙ্গিনীটাকে দেখেছি!"

কর্ণে হস্তাবরণ দিয়া ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"রাম!—রাম!—রাম! আবার সেই পাপ কথা আমার কানে!—রাম! রাম!"

মটুক বলিল,—

"রাম রাম মাথায় থাকুন, কথাটা একবার শুনে রাখুন। হেমাঙ্গিনী বৃন্দাবনে এসেছে, টুক্‌নি সার হোয়েছে! সঙ্গে আছে সেই নেপা;—সেটাও বোষ্টম সেজেছে! সাজবারইতো কথা; বুড়ীটাকে ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব নিয়ে, তারা দুজনে পালিয়ে আস্‌ছিলো, পথে ডাকাতেরা তাদের ধোরে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে; কাজে কাজেই হেমাঙ্গিনীর টুক্‌নি হাতে, নেপালের কাঁধে ঝুলি!"

নিশ্বাস ফেলিয়া ফটিক চাঁদ বলিলেন,—

"ঠিক্ হোয়েছে! মাথার উপর ভগবান আছেন, ঠিক্ বিচার হোয়েছে। সে সব কথা আর আমার কানে তুলো না। বৃন্দাবনে এসেছো, বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম কর।"

একমাস বৃন্দাবনে বাস হইয়াছিল। আরও এক সপ্তাহ অতীত হইল। অনন্তর মথুরা, প্রয়াগ, বারাণসী ও গয়াধামে পিণ্ডদান ও বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক ফটিক চাঁদ সপারিষদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ফটিক চাঁদ তীর্থ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বাটীর বাহির হন না। ফটিক ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গের সৎ স্বভাবের পরিচয় পাইয়া, দুই একটী করিয়া অনেকগুলি সৎ বন্ধু আসিয়া জুটিল এবং প্রতিদিনই সকাল বিকাল ফটিকের বাড়ীতে দাবা, তাস, পাশা, সদালাপ, গল্প-গুজব চলিতে লাগিল।

ফটিক চাঁদ মনের মত সৎ বন্ধু পাইয়াছেন, টাকা-কড়ি লোক-লস্কর কিছুরই অভাব নাই, তথাপি তাঁহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। অশান্তির কারণ, সবই পরের হাতে, সংসারের সামান্য হাট বাজার হইতে বৃহৎ জমীদারির হিসাব পত্র যাহা কিছু সবই পরের হাতে। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক সময়ে বাবুগিরি করিয়া রাশি রাশি টাকা যে খরচ ছিল, এখনও সেই খরচ। তাঁহাকে ভাল মানুষ পাইয়া লোকজনের আস্কারা যেন বেশী বাড়িয়াছে। এখন তাহাদের নকট খাতা-পত্র দেখিতে চাহিলে, যেন কেমন কেমন

বিরক্তি বোধ করে। ইহারই বা কারণ কি ? এই সকল চিন্তায় ফটিক চাঁদকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলে। বিব্রত করিবারই কথা : কেননা ফটিক চাঁদ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন, দিন দিন যেরূপ খরচের হিসাব বাড়িয়া চলিয়াছে,—তাহাতে তাঁহার বৃহৎ জমীদারি যে শীঘ্রই লাটে উঠিবে তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ফটিক একা প্রাণী, তিনিই বা কত দিক দেখিবেন। এক দিক হইলে বরং কিছু কিছু দেখিয়া উঠিতে পারিতেন, কিন্তু সকল দিক দেখা তাঁহার সাধ্যে কুলায় না। বিশেষ মেয়েলি ব্যাপারের কাজ-কর্ম্ম হিসাব-পত্র, মেয়েরাই বেশী বুঝে, ফটিক কিছু বুঝেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না—তিনি বাবু লোক, তাহার নিকট ও সকল আশা করা যায় কি ?

মটুক, দেবেন, সাতকড়ি ও ভূতনাথের কথা সময়ে সময়ে ফটিকের মনে হয়। তাহারা তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলে। তাহার কারণ, তাহারা সকলে বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, চাকরি বাকরি করিয়া, বেশ মনের সুখে আছে ; সংসারে মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে টাকা ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত, সংসারের কোন ভাবনাই ভাবিতে হয় না। তাহারা বলে যে, আগে আমার কাছ থেকে ইয়ারকি করিতে যে টাকা পাইত, তখনই সে সব ফুট কড়াই হইয়া যাইত, তখন তাহাদের মনে একটুকুও সুখ ছিল না—এখন সেই বদ্ স্বভাব যাইয়া, সংসারী হইয়া, কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তাহাদের দাম্পত্য সুখ দেখিয়া ফটিক চাঁদের এক একবার বিবাহ

করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করিবে কে? তিনি ত একা এ প্রস্তাব করিবে কে? ফটিক চাঁদ ত নিজে যাচিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারেন না?

ফটিক চাঁদ একদিন একাকী বসিয়া যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে—মটুক চাঁদ, দেবেন্দ্র নাথ, সাতকড়ি ও ভূতনাথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। প্রথমেই মটুক মুখ খুলিল, বলিল,—

"ফটিক চাঁদ, আজ তোমায় বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?"

ফটিক। কষ্ট ছাড়া কেউ কি আছে?

মটুক। তা নাই বটে, তবে তোমার কষ্টটা কি, তা কি জান্‌তে পারি নি?

ফটিক। আমার কষ্ট অনেক রকমের, তা তোমাদের কোন্‌টা বল্‌বো। একটা আধটা হ'ত তোমাদের বল্‌তুম্‌।

মটুক। তবুও শুন্‌তে পাই নি কি?

ফটিক। শুনে ত কিছু লাভ নেই. কেবল কথা বাড়ান।

মটুক। যদি বল্‌তেই কোন দোষ না থাকে, তবে শুন্‌তেই বা দোষ কি?

ফটিক। কথাটা কি জান? আমার সংসারে এতগুলি লোক কাজ কচ্ছে, যার যা মনে যাচ্ছে, সে তাই কচ্চে। আমি ত কিছু দেখ্‌তে পারিনি?

মটুক। সে তোমার দোষ। তুমিই ত ওদের আস্কারা বাড়িয়েচো। চোখ বুজে থাক্‌লে চোল্‌বে কেন?

ফটিক। ধর, ওদের আস্কারা দেখে, ছাড়িয়ে দিলুম্,—তারপর আমার দশা ?

দেবেন বলিল,—

"একেবারে ছাড়িয়ে দেবে কেন ? নজর্ রাখ্‌তে দোষ কি ? যখন না দেখ্‌তে,—না দেখতে, তখন তোমার মেজাজ ছিল দিল্ দরিয়া, এখনত তা নয়, এখন কিসে দুপয়সা থাকে তা'ত দেখ্‌তে হবে ?"

ফটিক বলিল,—

"বল্‌ছো ভাল।" সেই যে একটা কথায় বলে, "সর্ব্বাঙ্গে ঘা তা অষুধ দোবো কোথা ?" আমারও তাই। ভেতর-বার সব ঘায়ে পোরা। সব পর। কাকে রাখি, কাকে ছাড়াই বল ?

ফটিকের সংসারের কথা দেবেন সকলই জানিত। ফটিককে ভালমানুষ পাইয়া তাঁহার লোকজন কর্ম্মচারী যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছে, তাঁহাকে পথে বসাইতে বসিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ জানিত। কিন্তু সে কথা ফটিকের কানে তুলিলে পাছে ফটিক, কিছু মনে করেন, গরীবের অন্নে ধূলি দিতেছে মনে করেন, সেই ভয়ে দেবেন ফটিকের কানে সে কথা তুলিতে সাহস করে নাই। আজ ফটিকের মুখে ব্যক্ত হওয়ায় দেবেনের বড় রাগ হইল, বলিল,—

"একবার আমার উপর ভার দাও ত সব বেটাকে জব্দ ক'রে দি।"

দেবেনের স্বভাব ফটিক বিলক্ষণ জানিত, সে মনে করিলে সবাইকে ঢিট্ করিতে পারে, তা জানিত। তাই দেবেনকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন,—

"যাক্ যাক্ আমি একা প্রাণী, কি কর্‌বো বল, যাক্!"

সাতকড়ি ও ভূতনাথ বলিয়া উঠিল,—

"তুমি বিয়ে কর, বিয়ে কর, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমরাও এক সময়ে বামুনগুলে ছিলুম্। টাকা গুলো কে নিতো, কোথায় যে'ত, তা'র কিছুই পাত্তা পেতুম্ না। বিয়ে ক'রে অব্‌দি এখন টাকা কড়ি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি।"

ফটিকের মুখে আর কথা নাই—ফটিক যেন তাহাই সাব্যস্ত করিয়া লইলেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" জানিয়া দেবেন, নটুক প্রভৃতি সকল ইয়ার বন্ধু মিলিয়া, যুক্তি করিয়া, ফটিক চাঁদের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

উপসংহার।

তিন মাস পরে ফটিক চাঁদ দিব্য একটী সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিলেন; বিবাহের দুই বৎসর পরে, তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। পুত্রমুখদর্শনে ফটিক চাঁদের আনন্দ আর ধরিল না। পুত্রের জন্মোৎসবে মহোৎসব করিয়া তিনি পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রতিবাসী ভদ্র লোকেরা শত মুখে ফটিক চাঁদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কোন্ কুলে তাঁহার জন্ম, যাঁহারা তাহা না জানিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সৎকুলোদ্ভব মনে করিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। দান, ধ্যান, দেবদেবীর অর্চ্চনা, হরিসঙ্কীর্ত্তন, দরিদ্রগণকে অন্ন-বস্ত্র দান ইত্যাদি সদনুষ্ঠানে নিত্যানন্দে তাঁহার সময় যাপিত হইতে লাগিল।

ধন্য ফটিক চাঁদ! তোমার হৃদয়ের বলকেও ধন্য! নীচ বংশে জন্ম, বিদ্যাও যৎসামান্য, যৌবনে কুকার্য্যে প্রবল আসক্তি, তবু তুমি যেরূপ হৃদয়ের তেজস্বিতা দেখাইলে, সদ্বংশজাত শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন বড় বড় বিদ্বান বাবুরাও সকলে এরূপ সৎ দৃষ্টান্ত

দেখাইতে পারেন না। সংসার পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া তুমি নিজে সগৌরবে ধর্ম্মবীররূপে দণ্ডায়মান হইলে। পূর্ব্বে যাঁহারা তোমার নীচ কার্য্যের উৎসাহদাতা অনুচর ছিল, নিজের দৃষ্টান্তে তাহাদিগকেও তুমি সৎপথে ফিরাইয়া আনিলে। এখন তুমি ইহ সংসারে উদ্‌ভ্রান্ত লোকের জ্ঞানদাতা, শিক্ষাদাতা ও সন্মার্গগামী আদর্শ পুরুষ। এতদিনে তোমার হরিদাস নাম সার্থক হইল! তাই বলিতেছি, ফটিক চাঁদ! তুমি ধন্য!

সমাপ্ত।